উৎস মানুষ

৪৬তম বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
আহরণ	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	২
যুগল রায় স্মরণে		৩
ভুল ধারণা	মীরা নন্দা	
	অনু: আশীষ লাহিড়ী	৪
বর্ণবৈষম্য নির্মূল	অংশুমান কর	৫
পথ নিরাপত্তায় রঙ	পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	৭
লিমেরিটনিক	অনার্য মিত্র	১০
নাস্তিকের দুর্গাপুজো	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১০
ভয়ের ভালোমন্দ	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	১২
দানপুণ্য	দীপাবলি সেন	১৫
কৃষ্ণগহ্বর	সপ্তর্ষি ব্যানার্জী	১৭
বুকে ব্যথা	গৌতম মিস্ত্রী	২০
বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চল	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	২২
জীবরাসায়নিক অস্ত্র	শংকর ঘটক	২৪
বিজ্ঞানচর্চায় অশনি সংকেত	শ্যামল ভদ্র	২৭
প্রাকৃতিক অরণ্য	শান্তনু গুপ্ত	৩০
প্রতিবেদন		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩,
পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২
ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/
ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com
ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

উৎস মানুষের প্রয়াত সম্পাদক অশোককে সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর ওঁর প্রয়াণ মাসে যে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় আগামী ২২ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন দি বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাঘরে তা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি শুভানুধ্যায়ীরা ওই অনুষ্ঠানে আসবেন।

সদ্য দুর্গাপুজো শেষ হল, কালীপুজো আসছে। গণেশ, বিশ্বকর্মা দিয়ে শুরু হয়ে জগদ্ধাত্রীতে পুজোর সিজন শেষ। এ প্রসঙ্গে দুর্গাপুজো নিয়ে ঋত্বিককুমার ঘটক-এর মোক্ষম উক্তি —'শরতের নির্মল আকাশ হাসিতেছে। মা আসিতেছেন, আমাদের চিরকালের সেই দুর্গা, আমাদের মেয়ে বাঙালির প্রাণের বস্তু—তিনি আসিতেছেন। এইসব কথা আপনারা প্রচুর পড়িবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে মা নাই। মা ছিলেন। কিন্তু সে-যুগ গত হইয়াছে। এখন চোঙা প্যান্ট পরা কয়েকটি বালখিল্য বিকৃত উল্লাসে অভব্য আচরণ করিয়া বেড়ায় তাহাকে আপনারা বলেন দুর্গাপূজা। আমাদের শৈশবের যে স্মৃতি, তাহার সহিত আজকের এই অসহ্য কানফাটানো লাউডস্পীকারের আওয়াজ তক্ মেয়েদের মুখের লাল নীল রঙ-এ একদম মেলে না। মনে হয় অঙ্কে কোথাও একটা গরমিল হইয়াছে। আমাদের ধারণামতো মনে হয় দেশ বিভাগই ইহার মূল কারণ।'

প্যান্টালুনের ঘের চওড়া হয়েছে সাজার ধরণ বদলেছে তবে পুজোর নামে যা চলছে তা ঋত্বিকের উপলব্ধির বহুগুণ বেশি।

পুরাণ-এর কাহিনী ছোটবেলায় আমরা যেটুকু শুনেছি বা পড়েছি তা বাস্তবে, বিজ্ঞানসম্মত কি না যাচাই করার মতো বুদ্ধি ওই বয়সে পাকে নি। তবে পড়ার আনন্দ ও শোনার মজা পেয়েছি। তাই বোধহয় আজও পুরাণ পুরনো হয় নি। ঘটনা হল বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা সেই পুরাণের সঙ্গে বিজ্ঞান মিশিয়ে দিয়ে আজগুবি কথাবার্তা বলে চলেছেন। আমাদের ধারণা আসল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানমনস্কতাকে সমানে ধাক্কা মেরে মেরে ভিত নড়িয়ে দেওয়া। ন্যাশনাল স্পেস ডে-তে স্কুলের ছাত্রদের বলা হল নীল আর্মস্ট্রং নয় তার বহু আগে হনুমানজি অন্তরীক্ষে ঘুরে এসেছেন। আবার এক প্রাক্তন মন্ত্রী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেদ ও মহাকাব্য পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ তাতে লেখা আছে গাছ-গাছড়ার ওষধি গুণ আছে তা

জেনে হনুমানজি গন্ধমাদন পর্বত তুলে এনেছিলেন। রাইট ব্রাদার্স-এর উড়োজাহাজ আবিষ্কারের বহু আগে নাকি পুষ্পক রথ চালু ছিল। কে একথা বললেন, না দেশের কৃষি মন্ত্রী। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তন, 'বিশ্বের সবথেকে বড় প্রতারণা।' দেখেশুনে মনে হয়, পুরনো সভ্যতা, পুরনো শাস্ত্র, পুরনো তত্ত্ব ইত্যাদির নাম করে মানুষকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত। এসব অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মাথায় একবার ঢুকিয়ে দিলে বেশ উর্বর জমি তৈরি হবে তাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়াই এসব হাস্যকর বক্তব্য বিজ্ঞান বলে চালানো যাবে। এই প্রসঙ্গে প্রয়াত যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক অবনীভূষণ ঘোষ-এর উক্তি স্মরণীয়—'বুদ্ধি হ'ল যুক্তির রাজ্য। যুক্তি দাঁড়িয়ে থাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিরিখে জ্ঞান পরিণত হয় বিজ্ঞানে। পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের সব তথ্য আমাদের কাছে একেবারেই ধরা পড়ে না। ক্রমে ক্রমে আমরা তা জানতে পারি। সেজন্যে আজ যা' বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, কাল দেখা যায় তা' বুদ্ধিগম্য হয়েছে।

হেডফোনে বধিরতা বাড়ছে এমনই অভিমত ইএনটি বিশেষজ্ঞদের। ৫০ ডেসিবেলের কম শব্দক্ষমতাযুক্ত হেডফোন ব্যবহার করতে হবে, টানা দু'ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ডিজে নিষিদ্ধ হলেও তা কেউ তোয়াক্কা করে না।

গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে টানা ক'দিন কলকাতা জলে ভাসল। জল ভেঙে হাঁটার সময় বিদ্যুতের তারের ছোবল খেয়ে চলে গেল কয়েকটি প্রাণ। ভারি বৃষ্টিতে কলকাতা ভাসবে তা নিয়ে পরিবেশবিদরা বারবার পৌরসভা ও রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছেন। জমা জল বেরোবার পথগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে রক্ষা করা যে কত জরুরি তা নিয়ে প্রযুক্তিবিদ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা যেসব পরামর্শ দিয়েছেন তা শুনলে মানুষকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। কিন্তু তা শুনছে কে? উত্তরাখণ্ড থেকে উত্তরবঙ্গ এমনকি হিমাচলও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। ইদানিং ম্যান-মেড কথাটা অধিক ব্যবহারে কিঞ্চিত লঘু হয়ে গেছে। তাই পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে পরিবেশবিজ্ঞানীদের সতর্কতা না শোনার মাশুল দিতে হচ্ছে।

উমা

আহরণ

স্বাধীনতার মানে

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

যে ছেলেটা বস্তা-কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়
যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে, পালক ছাড়ায়,
যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা-গেলাস-বাটি
যে ছেলেটা সারাজীবন খায় লাথি-কিল-চড় ও চাঁটি!
ওদের কাছে প্রশ্ন কোরো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে
'স্বাধীনতা' কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে?
যে মেয়েটা ভোর-না-হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে
যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে, বাসন মাজে,
যে মেয়েটা গোবর কুড়োয়, ঘুঁটেও দেয়, কয়লা বাছে
যে মেয়েরা সারাজীবন পায়না আদর কারোই কাছে!
ওদের কাছে প্রশ্ন কোরো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে
'স্বাধীনতা' দেখতে কেমন? স্বাধীনতার সঠিক মানে?
যে ছেলেটা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো
যে ছেলেরা ট্রেনের হকার, খাচ্ছে রোজই লোকের গুঁতো,
লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের, করছে তারাই লজেন্স ফেরি
যাদের বুকে সূর্য ওঠার, গোলাপ ফোটার অনেক দেরি!
ওদের কাছে প্রশ্ন কোরো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে
'স্বাধীনতা' জিনিসটা কী? স্বাধীনতার সঠিক মানে?
স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল-আকাশের বন্ধু পাখি
স্বাদীনতার মানে বুঝেই চাঁদ তারাদের পরায় রাখি,
স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড়-সাগর-ঝরনা-নদী
স্বাধীনতার মানে বুঝেই বইছে বাতাস নিরবধি!
স্বাধীনতার সঠিক মানে ক'জন স্বজন সত্যি জানে
স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে!

উমা

২০২৬-এর বইমেলায় আমরা থাকছি।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অক্লান্ত সৈনিক যুগলকান্তি রায় প্রয়াত

জন্ম : ১ মার্চ ১৯৩৩ প্রয়াণ: ৬ আগস্ট ২০২৫

উত্তাল সত্তর দশকে যুব সমাজের একটা অংশ যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতাকে আশ্রয় করে। শুরু হয় অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। তারই জেরে বাংলা ভাষায় উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, অন্বেষা, আনৃণ্যর মতো পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সূত্রপাত হয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের। তার আগে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তৈরি করেছেন বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য। প্রকাশিত হয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। মনোরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গড়ে তোলেন পাভলভ ইনস্টিটিউট, প্রকাশ করতে থাকেন 'মানবমন'। বহু কৃতী মুক্তবুদ্ধির ছাত্রছাত্রী এই উদ্যোগে শরিক হন। তাঁদেরই এক উল্লেখ্য নাম যুগলকান্তি রায়। জন্ম মেদিনীপুরে, ১ মার্চ ১৯৩৩। তবে পড়াশোনা বেলুড় মঠে। পরে ফিজিক্সে সাম্মানিক স্নাতক এবং এমএসসি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্র যুগলকান্তি ১৯৭৫ সালে যুক্ত হন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে। ১৯৭৯ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হন। বিজ্ঞান নিয়ে লেখালিখি শুরু করেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিষয় প্রথাগত বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তুলতে যুগলকান্তি গণবিজ্ঞান পত্রপত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঝরঝরে বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে পারতেন। তাই ১৯৮০ সালে 'আজকাল' সংবাদপত্রের শুরুতেই তৎকালীন সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ ওঁকে ডেকে নেন বিজ্ঞানপাতার সম্পাদনার জন্য। প্রতি সোমবার আজকালের বিজ্ঞানের পাতা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নব্বই দশকের গোড়ায় বিজ্ঞানের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যুগলকান্তি কিছুদিন সংবাদ প্রতিদিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও উৎস মানুষ, কিশোর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেলার মতো বহু পত্রপত্রিকার সঙ্গে ছিল তাঁর যোগ। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ১৯৮৮ সালে তাঁকে 'সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করে।

আইনস্টাইনের সঙ্গে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে পত্রালাপ এক বড় প্রাপ্তি ছিল ওঁর। জল নিয়ে একটি চমৎকার বইও লিখেছেন। কোভিডের পর থেকেই বাইরে বেরনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি বেশ কিছুদিন নিউমোনিয়া ও অন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ৬ আগস্ট, সকাল ৭টা ৫-এ ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন যুগলকান্তি। চিন্মোহন স্নেহানবিশ বা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের মতো ওঁর পরিবার ভুল করে নি। ওঁর মরদেহ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়। নিরীশ্বরবাদী যুগলকান্তির শ্রাদ্ধশান্তিও হয় নি। প্রাক্তন স্কুলশিক্ষিকা স্ত্রী, চিকিৎসক কন্যা, জামাই ও নাতনি বাড়িতেই এক স্মরণসভার আয়োজন করেন, ১১ আগস্ট, সোমবার সন্ধেয়। এছাড়াও, ১৬ আগস্ট বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

২০০৩-০৪-০৫ বছরগুলোতে উৎস মানুষ নানান কারণে একটু বেকায়দায় পড়ে। যুগলদা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যান। উৎস মানুষ পরিচালকমণ্ডলীতে থেকে ওঁর মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় যুগলদার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। শ্যামবাজারে কেদার মোদকের বাইরের ঘরে উৎস মানুষের মিটিংয়ে যুগলদা নিয়মিত আসতেন। একটা ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিখ্যাত অধ্যাপকের প্রয়াণের বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের অপ্রকাশিত একটি লেখা উৎস মানুষকে দেন। লেখাটি নিয়ে নিজেদের মতানৈক্য হয়। পত্রিকায় তা দেওয়া যাবে না বলে ঠিক হয়। এখন সেই অধ্যাপকের ছাত্রকে, যিনি আবার আমাদেরও শ্রদ্ধাভাজন মানুষ—কে লেখাটা ফেরত দেবে? যুগলদা সেই কঠিন কাজটা করলেন। এসব ঘটনা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

উমা

ভুল ধারণা কোথা হতে আসে?

মীরা নন্দা

বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মন অথবা চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জলে গোলা নুন রূপে, যার প্রতিটি কণা জলে উপস্থিত কিন্তু আলাদা করে তাকে চেনবার জো নেই। বাস্তবে পরীক্ষিত ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এ এক অতি চমৎকার যুক্তি। তেমনি, অদেখা, সর্বময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্থবহ হয়ে ওঠে এই পৃথিবীতে দৃষ্ট পিতার ঐশী উপমান হিসেবে। গাঁজাখোর কিন্তু পত্নীপ্রেমিক স্বামী ও সংসার-উদাসীন কিন্তু দরদি পিতার অতুলনীয় ভাবমূর্তি শিব। যুগপৎ সংহারী ও স্নেহশীলা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী দেবীর কল্পনা অর্থবহ হয়ে ওঠে বাস্তব সংসারের যুগপৎ সন্তানপ্রিয়া কিন্তু চ্যালাকাঠধারিণী মায়ের ভূমিকার অনুষঙ্গে। তাই দেব-দেবীদের সঙ্গে মান-অভিমান-খুনসুটি পর্যন্ত চলে, রামপ্রসাদের গান যার অপরূপ দৃষ্টান্ত।

বাস্তবিক ধর্ম জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে এই ধরনের বাস্তব ঘটনার আধ্যাত্মিক তুলনার ওপর।

কিন্তু শুধু কি ধর্ম? বিজ্ঞানেও এই তুলনা-ভিত্তিক যুক্তি-প্রক্রিয়ার উদাহরণ প্রচুর। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটছে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার তুলনা দিয়ে, যা একটা ভাবনাকে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যায়। কোপারনিকাস লিখেছিলেন, সূর্য যেন রাজা, আর তার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরছে তাঁর অনুষদ-পর্ষদের দল, যাদের আমরা বলি গ্রহ। পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, কোপারনিকাসের এই ভাবনাটাকে গালিলিও সমর্থন করেছিলেন তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা চাঁদের চলনের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করে। অতবড়ো একটা পাথরের পিণ্ড যদি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে পারে তাহলে পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘুরতে পারবে না? দ্বাদশ শতকে এইরকমই যুক্তি দিয়েছিলেন ভাস্করাচার্য। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর মতো একটা বিরাট বস্তুপিণ্ড আকাশে নিরালম্ব ঝুলে রয়েছে। বিরোধীরা বললেন, তা কখনো হতে পারে? কেউ বা কোনো কিছু নিশ্চয়ই ওটার ভার বহন করছে। এক কথায়, পৃথিবীর একটা কোনো ধারক আধার আছে। সেই আধারটাকে বাসুকী বা অন্য কোনো সাপ বা ব্যাং বা ছাগল বা উল্লুক নাম দিলে দোষ কী? বিরোধী পক্ষের এই কাণ্ডজ্ঞান-ভিত্তিক আপত্তি খণ্ডনে ভাস্করাচার্য বলেছিলেন, সেই আধারেরও তো তাহলে আরেকটা আধার থাকতে হবে। এবং তারও, এবং তারও...। এর কোনো অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত এটা যুক্তিশাস্ত্রের 'অনবস্থা দোষে' পর্যবসিত হবে। সোজা কথায়, ওটা অচল। পশুপালকরা যেভাবে কৃত্রিমভাবে পশুশাবকের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ জাতের ভেড়া, শুদ্ধ-বংশীয় (থরো-ব্রেড) ঘোড়া কিংবা হরেক গৃহপালিত কুকুর যার পরিচিত দৃষ্টান্ত, তার সঙ্গে তুলনা করে চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। মানুষের জনসংখ্যা আর খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত টমাস ম্যালথস-এর একটি রচনার সঙ্গে তিনি প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার লড়াই-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং তা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বনেদটা তৈরি করেন।

তাহলে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাত কী? তফাত আছে। সেই তফাতটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে এই তুলনাগুলি অনেকাংশেই নিছক সম্ভাব্য পথ হিসেবে, হাইপোথিসিসহিসেবে কাজ করেছে। কৃত্রিম পশু-প্রজননের ওই তুলনাগুলো প্রকৃতিতে খাটে কিনা তা যাচাই করবার জন্য ডারউইন প্রায় কুড়ি বছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কারা বেশি পটু তাদের যাচাই করেই প্রকৃতি নতুন প্রজাতি তৈরি করে—এই ধারণার সপক্ষে সমর্থন খুঁজেছিলেন। কাজেই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বর আসল তফাত হচ্ছে, তুলনা বা উপমা থেকে উৎসারিত তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে যাচিয়ে নিতে বাধ্য। ধর্মের যে-দায় নেই, সেই বাধ্যবাধকতা নেই।

বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার কষ্টিপাথরে নিজের বা অন্যের ধারণা বা অনুমানের ঠিক-ভুল যাচাই করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটাই বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান করে তুলেছে। ওটা বাদ দিলে শুধু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনাত্মক যুক্তির জোরে সিদ্ধান্ত পেশ করলে সেটা বড়ো জোর একটা অভিমত, প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় "সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তা"। এ "এমন এক চিন্তাশৈলী যা মনে করে দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেই তারা বুঝি কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত" (পল থ্যাগার্ড, কম্পিউটেশনাল ফিলসফি অব সায়েন্স, এম আই টি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ১৬২)। এটাই হল মেকি বিজ্ঞান গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। এই 'তুলনাত্মক চিন্তার এক ছায়াচ্ছন্ন

যমজ আছে যা বিজ্ঞানের বদলে মেকি বিজ্ঞানে গিয়ে পৌঁছয়'।

নিছক বাহ্য সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণায় উপনীত হলে সাদৃশ্যভিত্তিক তুলনাত্মক চিন্তা শেষ পর্যন্ত জাল বিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠে, তা আর সৃষ্টিশীলতার উৎস থাকে না। কারণ এর ফলে অর্থ আর তাৎপর্যের অনেকগুলো অবাঞ্ছিত পরত এসে যুক্ত হয়। সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কে উপনীত হওয়ার তাৎপর্য হল : যেসব জিনিস বা প্রক্রিয়া দেখতে বা অনুভবে একই রকম, ধরে নেওয়া হয় যে তারা পরস্পরের প্রতি এবং বাকি বিশ্বের প্রতি একইভাবে ক্রিয়া করবে। কাজেই একটাকে বুঝতে পারলেই আপনার মনে হবে যেন অন্যটাকেও বুঝে ফেলেছেন; একটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আপনা থেকেই যেন অন্যটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, শ্রমসাধ্য যাচাইকরণ কিংবা ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের আর কোনো দরকার নেই।

এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের রং লাল। রক্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়, মঙ্গলগ্রহ রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ আর হানাদারি প্রভৃতি অমঙ্গলের সূচক। অপরদিকে পৃথিবীর নিকটতম, উজ্জ্বলতম, স্নিগ্ধ "সুন্দরী তুমি শুকতারা" (ভেনাস), যাকে দুবেলা চোখে দেখা যায়, সে হল সৌন্দর্য আর মাতৃত্বের প্রতীক, যদিও আসলে তা ভয়ংকর বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা। ধাতুজগতে সোনা যেন গ্রহজগতে সূর্য, কিংবা শরীরে যেন হৃৎপিণ্ড। সূর্য আর সোনার মধ্যে এই আলংকারিক আপাত-সাদৃশ্য থাকায় ধরে নেওয়া হয়, হৃৎপিণ্ডের উপরে সোনা ধারণ করলে তা সূর্য থেকে উপকারী শক্তি টেনে আনবে হৃৎপিণ্ডে। সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তাই মানুষকে ভাবতে শেখায়, যার হাতের লেখা খারাপ সে অগোছালো, হাতে তালুতে দীর্ঘ 'আয়ুরেখা' দীর্ঘায়ুর দ্যোতক, প্রশস্ত-ললাট ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি বেঁটেখাটো নাক-চ্যাপ্টা শূদ্রদের চেয়ে বেশি। নানা বস্তুর মধ্যে কল্পিত এইসব সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছে একমাত্রিক সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তার ভিত্তিতে—কঠোর নিয়মবদ্ধ, নিশ্ছিদ্র পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়। তাই তা বিজ্ঞান নয়। মেকি বা জাল বিজ্ঞানের সঙ্গে খাঁটি বিজ্ঞানের আসল তফাত হল, বিজ্ঞান নতুন নতুন তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নতুন আবিষ্কৃত তথ্যাদির ব্যাখ্যা দিতে দিতে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে। প্রয়োজনে পুরোনো তত্ত্বকে বদলে নিতে, এমনকী বর্জন করতে পিছপা হয় না। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান মত আর প্রয়োগ উভয় বিচারের অচলাবস্থায় পড়ে থাকে। আপ্তবাক্যই তার আশ্রয়। **সায়েন্স ইন স্যাফ্রন, ২০১৫**

অনুবাদক : আশীষ লাহিড়ী উমা

বর্ণবৈষম্য নির্মূল করতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা

অংশুমান কর

ঘটনা ১

উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি আবার এক দলিত পরিবারকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছু দুষ্কৃতী আচমকা এসে বর ও কনের পরিবারকে নির্মমভাবে মারধর করে।

কেন? কারণ, ওই দুষ্কৃতীদের বক্তব্য ছিল—একজন দলিত হয়েও তারা কীভাবে সাহস পায় একটি বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে করার? দু-টি পরিবারের সদস্যদের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। যদিও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা যায় নি।

ঘটনা ২

গুজরাটের আমরেলি জেলায়, অন্য বর্ণের এক কিশোরকে বেটা বলে সম্বোধন করার অপরাধে, এক দলিত ব্যক্তিকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। ছ-দিন পরে ২২ মে ২০২৫-এ হাসপাতালে তিনি মারা যান। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬ মে। এফআইআর-এর তথ্য অনুযায়ী, রাঠোর নামের ওই ব্যক্তি একটি ভুজিয়ার দোকানের পাশের একটি দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন। সেখানে দোকানদারের কিশোর ছেলেটিকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করে সাহায্য করতে চাইলে দোকানদার চোথা খোড়া ভরওয়াড় এতটাই রেগে যান যে, তিনি একটি লোহার রড দিয়ে রাঠোরকে মারার চেষ্টা করেন। রাঠোরের এক বন্ধু বাধা দিতে এলে তাকেও মারধর করা হয়। পরে রাঠোরের কাকা সুরেশ ভালা দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে, ভরওয়াড় আরও কিছু লোক ডেকে এনে তাঁদের ওপরেও চড়াও হন। পালানোর চেষ্টা করলেও ওই দলিতদের ক্রমাগত মারধর করা হয় এবং বলা হয়, তারা যেন সমাজের বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম না করে। অবশেষে এক প্রবীণ ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করায় হামলা বন্ধ হয়।

ঘটনা ৩

বিহারের একটি ১০ বছরের ধর্ষিতা কন্যাশিশু চিকিৎসার

অভাবে পাটনার পিএমসিএইচ-এ ১ জুন ২০২৫-এ মারা যায়। দিনটি ছিল রবিবার। অভিযোগ, শনিবার ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তাকে অ্যাম্বুলেন্সে অপেক্ষা করতে হয়েছিল চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। এই বিলম্বের কারণেই শিশুটির অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে।

বর্ণবৈষম্য নির্মূল হয় নি

এই তিনটি ঘটনা কোনো ব্যতিক্রম নয়। যখন গোটা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় ত্রস্ত, তখন ভারতবর্ষে প্রায় নিঃশব্দেই বর্ণবৈষম্যের একের পর এক ঘটনা প্রতি সপ্তাহেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসছে। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও এতগুলি রাজ্যে বর্ণবৈষম্য একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রশ্ন উঠবেই, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো কি যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে সমাজ থেকে বর্ণবৈষম্য নির্মূল করার জন্য? বহু প্রকল্প ও নীতি—এমনকি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আম্বেদকরের নামে বিভিন্ন কেন্দ্র ও চেয়ার গঠিত হয়েছে। তবু ২০২৫ সালে এক রাজ্যে দলিতরা মার খাচ্ছে বিয়েবাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য, তো অন্য রাজ্যে 'বেটা' বলার জন্য।

সমাধান— এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে কী করা যেতে পারে? এর জন্য যে দলিতদের রাজনীতি, শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণই যথেষ্ট নয়— এটা এবার আমাদের বোঝার সময় হয়েছে। আরও কিছু জরুরি পদক্ষেপ এখনই নেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গেই উঠে আসে কতগুলি প্রশ্নও।

প্রথমত, আমাদের দেশে কি দলিতদের জন্য আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে? উত্তর হল, না, নেই। কিন্তু আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও, দলিতরা বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। কারণ, আইন প্রায়শই প্রয়োগ হয় না। একটি সম্প্রদায়ের জন্য বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা যে কোনো বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়। বর্ণবৈষম্য এর ব্যতিক্রম নয়। অনেক ক্ষেত্রে দলিতরা আইনের দরজায় কড়া নাড়তেই পারছেন না। আইনের সুরক্ষা যাতে দলিতরা পান সেই বিষয়ে সরকারকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় যে, যখন দলিতরা আদালতে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন এবং রায় তাঁদের পক্ষে যাচ্ছে তখনও কিন্তু আদালতের রায়গুলি অনেক সময় বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠা পাওয়া ধ্যান-ধারণা, ক্ষমতার অসমবণ্টন, পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশিক্ষণের অভাব বা তাদের সচেতনতার অভাব। দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও আদালতের রায় কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে পুলিশের ভূমিকায় নজরদারি অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উচিত দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত ও বিচার সুনিশ্চিত করা। এই ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা হলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে ও তারা দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি দিতে হবে।

একইভাবে, আইনি সহায়তা প্রদান, দলগত অভিযোগ গ্রহণে অসুবিধা এবং এনজিওদের দলিতদের অধিকারের পক্ষে কাজ করতে উৎসাহিত করাও প্রয়োজন। এই কাজগুলি করতে হবে সরকারকেই। সরকারি কর্মচারী, পুলিশ ও বিচার বিভাগের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমেও সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বর্ণবাদী মনোভাব থেকে তাদের মুক্ত করা যেতে পারে। এর দায়ও তো সরকারের ওপরেই বর্তায়।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সর্বত্র দলিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দলিতদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সংস্থাতেও তাঁদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এতে তাঁদের প্রজ্ঞাকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তেমনই নিজেদের জীবন প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়ার ও সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার শক্তি তাঁরা পান।

এই ক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য নাগরিক সমাজের ভূমিকাও অপরিসীম। সরকারকে এমন একটি সামাজিক পরিসর গড়ে তুলতে হবে যেখানে এনজিও এবং মানবাধিকার কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। এঁদের ভূমিকা শক্তিশালী হলে জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। নাগরিক সমাজের সঙ্গে সরকারের যে কোনো সংলাপেই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা উচিত, বিশেষ করে যখন আলোচনার ফলাফল সরাসরি তাঁদের জীবনে প্রভাব ফেলে।

এছাড়াও সরকারের উচিত এমন প্রচারমূলক কর্মসূচি নেওয়া যাতে আইনি সচেতনতা বাড়ে, দলিত ও প্রভাবশালী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই। ছোঁয়াছুঁয়ির ভিত্তিতে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে আমাদের দেশে যে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই বার্তাটিকেও আরও স্পষ্টভাবে, আরও নিয়মিত পৌঁছে দিতে হবে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের কাছে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন —তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে সবথেকে বেশি যেটা দরকার, তা হল রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে দলিতদের শুধুমাত্র ভোটব্যাংক হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে। দেখা গেছে, এক রাজ্যে ঘটে যাওয়া বৈষম্যের ঘটনায় যেই দলটি সরব, অন্য রাজ্যে একই ধরনের ঘটনায় তারা চুপ করে থাকে।

দলিতদের আজও এদেশে সংসদীয় রাজনীতির খেলায় পণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর চেয়ে দুঃখের আর কীই বা হতে পারে! পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে দলিতদের কেবল ভোটবাক্স হিসেবে দেখলে চলবে না।

চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়া —রাজা রাওয়ের লেখা কন্থাপুরা উপন্যাসে (১৯৩৮) ব্রাহ্মণ যুবক মূর্তি দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট একটি গ্রামে জাত-বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। কিন্তু যখন তাঁকে এক দলিত গরিব রচন্নার কুঁড়েঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানানো হয়, সে পড়ে যায় অদ্ভুত এক দ্বিধায়। দাঁড়িয়ে পড়ে ঘরটির চৌকাঠের ঠিক আগে। শেষ পর্যন্ত মূর্তি সেই দ্বিধা কাটিয়ে রচন্নার স্ত্রীর আমন্ত্রণে তাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং দেখতে পায়ে ঘরটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, ঠিক একটি ব্রাহ্মণ বাড়ির মতোই। দলিতদের সম্পর্কে যে সমস্ত ভুল ধারণা বহু বছর ধরে বহন করছিল মূর্তি, মুহূর্তে সেই সমস্ত ধারণা পালটে যায়। মূর্তি যা পেরেছিল ভারতবর্ষ তা পারছে না। আজও ভারত সেই দলিত ভারতের কুঁড়েঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ঘরটির ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। **উমা**

পথ নিরাপত্তায় শখের রঙ নয় বরং চাই দৃশ্যমানতার নিরিখে শ্রেষ্ঠ রঙ

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

বিশ্বায়নের সাথে তাল রেখে এদেশেও নগরায়ন ঘটে চলেছে দ্রুত লয়ে। গ্রাম থেকে শহরে ছুটছে মানুষ উন্নত আয়ের আশায়, উন্নত জীবনের মানের টানে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ গ্রামে বাস করলেও দেশের জিডিপির দুই তৃতীয়াংশ কিন্তু আসে এখন দেশের শহরাঞ্চল থেকেই। ফলে নগরায়িত অর্থনীতির নতুন নকশায় পরিবহন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে এ যুগে অন্যতম চাহিদা। বিশেষত গত কয়েক দশকে এদেশের সড়ক পরিবহনের পরিকাঠামো খোল নলচে বদলেছে। দেশের নতুন উদার অর্থনীতি চালু হয় নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। ফলে তখন থেকেই দেশের অর্থনীতির ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে উঠে এসেছে সড়ক যোগাযোগ উন্নতি ভাবনা। উন্নত সড়ক মানে দ্রুতগতি। ফলে মান্ধাতার আমলের পুরনো সড়ক সম্প্রসারণ ও নির্মাণ হয়ে চলেছে দেশের বেড়ে ওঠা পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের চাহিদা পূরণ করতে। শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে ছোট শহরের সাথে বড় শহরের যোগাযোগ কিংবা গ্রাম শহরের যোগাযোগ উন্নত হতেই হৈ হৈ করে বেড়ে উঠেছে গাড়ির সংখ্যা রাস্তা জুড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, জনঘনত্বের নিরিখে কেরলের পরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একই সাথে রাজ্যে সড়কের ঘনত্ব তুলনায় বেশি। এই প্রেক্ষিতে উন্নত রাস্তায় যাত্রী কিংবা পণ্যবাহী গাড়ির বাড়তি গতি বহু ক্ষেত্রেই পথ নিরাপত্তার নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। ফলে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা, বাড়ছে পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি। এই মুহূর্তে দেশের প্রতি চার মিনিটে একজন করে মানুষ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। ফলে উন্নত রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়ছে সেই দুর্ঘটনায় রাশ টানতে। সন্দেহ নেই যে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা গাড়ি চালকের। কিন্তু চালকদের রাস্তায় নিরাপদে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সুরক্ষার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ দেওয়া হয় রাস্তা জুড়েই। ফলে রাস্তা বরাবর দেশের পথ সুরক্ষায় লক্ষ্যে বিভিন্ন চিহ্ন এবং সংকেত ব্যবহার করা হয়। এমন বহু চিহ্ন বা সংকেত যেমন দেওয়া থাকে পথচারীদের জন্য আবার তেমনই বহু চিহ্ন ব্যবহৃত হয় গাড়িচালকদের জন্য। এমন চিহ্ন ও সংকেত চিনতে ভুল করলে কিংবা চিনেও সেগুলি অমান্য করলে পথ দুর্ঘটনার ঝুঁকি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলে। ফলে সড়ক নির্মাণ ও পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মাবলী দেশজুড়ে তৈরি করে ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস (IRC)। ফলে IRC-র বিধি মেনেই রাস্তায় নির্মাণ থেকে শুরু করে পথ নিরাপত্তার যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। ফলে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনামায় যেমন থাকে সড়ক নির্মাণের বিভিন্ন সামগ্রিক গুণমানের মাপকাঠি তেমনি থাক পথ নিরাপত্তায় বিভিন্ন চিহ্ন ও সংকেত। যেমন

পথচারীরা দ্রুতগতির রাস্তায় যত্রতত্র রাস্তা পারাপার করলে দুর্ঘটনার প্রবল ঝুঁকি থাকে। ফলে সে ক্ষেত্রে রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে জেব্রার গায়ের রঙের নকশার আদলে রাস্তায় সাদাকালো দাগ দিয়ে রাস্তা পারাপারের পথ চিহ্নিত করা থাকে। ফলে সেই জেব্রা চিহ্ন পথচারীদের সুরক্ষা জোগায়। কারণ রাস্তায় গাড়ির চালক রাস্তার ওপরে জেব্রা চিহ্ন দেখলেই গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করার কথা। ওটাই চালকের ক্ষেত্রে নিয়ম। ফলে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে মানুষ পারাপারের সময় দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় পথচারীর নয়, বরং সেই দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তায় গাড়ির চালকের।

ফলে এভাবেই রাস্তায় ঠিক ভুলের মাপকাঠি তৈরি হয় বহু চিহ্ন ও সংকেতের উপর ভিত্তি করে। যেমন শহরের বড় রাস্তায় বিভিন্ন সংযোগস্থলে লাগানো সিগন্যাল ব্যবস্থার চিহ্ন সংকেতের ওপর নির্ভর করেই রাস্তার ক্রসিংগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাস্তার সিগন্যালে তিন রঙের বাতি ব্যবহৃত হয়—সবুজ, হলুদএবং লাল আলো। যেগুলির অর্থ প্রায় দেশের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জানেন। লাল আলোর অর্থ বিপদ। ফলে লাল আলোয় গাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারবে না। ঠিক তেমনি নিরাপদে গাড়ি চলাচল করতে পারে রাস্তার ক্রসিং-এ সবুজ আলোর চিহ্ন দেখেই। কিন্তু রাস্তার ক্রসিং কিংবা ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম সিগন্যালের ওই রং গোটা দেশ এমনকি গোটা পৃথিবী জুড়ে অভিন্ন। কোনোভাবেই সবুজ মানে বিপদ কিংবা লাল বাতি মানে নিরাপদ এমন ব্যবস্থা কোথাও চালু করা যায় না দেশে কিংবা বিদেশে, গ্রামে কিংবা শহরে। কারণ ওই রঙের নির্বাচন দেশের মন্ত্রী আমলাদের পছন্দ নির্ভর নয় বরং ওই রঙের ব্যবহারের পেছনে রয়েছে ওই আলোগুলোর দৃশ্যমানতার প্রশ্ন। পথ দুর্ঘটনা দিনের আলোয় যা ঘটে, তার চেয়ে বেশি ঘটে রাতের কিংবা ভোরের অন্ধকারে। ফলে পথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিগন্যালের বাতির রং থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের সাইনবোর্ড কিংবা রাস্তার উপরে বিভিন্ন দিক নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত রঙের দৃশ্যমানতার উপর নির্ভর করে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে সরকারি অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের বাড়ি সবেতেই নীল-সাদা রংয়ের ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এমনকি এক্ষেত্রে অনেকে জয়পুরের মতো 'পিঙ্ক সিটি', যোধপুরের মতো 'ব্লু সিটি', উদয়পুরের মতো 'হোয়াইট সিটি' কিংবা নাগপুরের মতো 'অরে—জ সিটি'র আদলে রাজ্যের শহরগুলির বর্ণ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করেছে সরকারি ভাষ্যে। কিন্তু রাজস্থানের জয়পুরে শহর জুড়ে নির্মাণে টেরাকোটার গোলাপি রঙের প্রভূত ব্যবহার কিংবা উদয়পুরের সাদা মার্বেলের ব্যবহার কিংবা নাগপুরে প্রচুর কমলালেবুর ফলনের সাথে ঐতিহাসিকভাবেই জড়িয়ে গেছে ওই বিভিন্ন শহরগুলির নামের সাথে বিভিন্ন বর্ণের যোগ। সেগুলি কোনো ক্ষেত্রেই প্রশাসন আরোপিত বর্ণবিন্যাস ছিল না। সেই প্রেক্ষিতে কলকাতা শহরের বাড়িঘর, অফিস আদালতের রং নীল-সাদা হলেও সেগুলি বিরক্তিকর একঘেয়ে কিন্তু বিপজ্জনক নয়।

কিন্তু নীল-সাদা রংয়ের সেই প্রভাব যখন এসে পড়ে রাজ্যের পথ নিরাপত্তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তখন পথ দুর্ঘটনার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে মানুষের বিবেচনায়। রাস্তায় মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দিক নির্দেশকারী বোর্ডের রং কিংবা রাস্তার ধারে kerb কিংবা রাস্তার ডিভাইডার বা মিডিয়ানের ধার ঘেঁষা পাথর স্তম্ভগুলির রং নীল সাদা করে ফেলেছে রাজ্যের প্রশাসন। পথ নিরাপত্তার সাথে যুক্ত এমন প্রতিটি পরিকাঠামোর রং নীল সাদা হওয়ায় রাতে কিংবা চড়া রোদে সেই রঙের দৃশ্যমানতা কমছে। ফলে বাড়ছে চালকের ভুলে দুর্ঘটনা। IRC-র সুপারিশ অনুযায়ী কালো হলুদের ডোরাকাটা কিংবা সাদা কালো ডোরাকাটা রঙ দৃশ্যমানতার নিরিখে সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু IRC-র সেই বিধানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রাজ্যের সর্বত্র প্রায় পথ নিরাপত্তার পরিকাঠামোর উপরে নীল সাদা রংয়ের ব্যবহার দুর্ঘটনার ঝুঁকি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছে। এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা রুজু হয়েছে। সেই মামলায় রাজ্য সরকারের আইনজীবী দাবি করেছেন যে, IRC-র পথ নিরাপত্তার বর্ণবিধি মেনে চলাটা রাজ্যের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রেক্ষিতে নীল সাদা রংয়ের দৃশ্যমানতার স্বপক্ষে আদালত রাজ্য সরকারকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি হাজিরের নির্দেশ দিলেও আজ অবধি নীল-সাদার পক্ষে সরকারি তথ্য প্রমাণ হাজির করা যায় নি। বিশেষত হাল আমলে শহরের রাস্তা কিংবা জেলার বড় রাস্তাগুলির যত্রতত্র গার্ডরেল বসিয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কিন্তু ওই গার্ডরেলগুলির অন্ধকারে দৃশ্যমানতা কমে গেলে সেগুলি দেখে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা বা সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া ভীষণ মুশকিল হয় গাড়িচালকদের। ফলে রাতের রাস্তায়

ওই নীল সাদা রঙের গার্ডরেলগুলি দুর্ঘটনার অন্যতম আখড়া হয়ে ওঠে। শুধু গার্ডরেল নয়, পথের ধারে বিভিন্ন বাঁকের আগে রাস্তার ধারে লাগানো বোর্ডে বহু চিহ্ন দেওয়া থাকে যাতে চালক আগাম সেই রাস্তার সামনে নিকটস্থ সরু ব্রিজ, কালভার্ট অথবা বিপজ্জনক বাঁক কিংবা স্কুল-কলেজ, বাজার অথবা একাধিক রাস্তার ক্রসিং সম্পর্কে আগাম অনুমানের ভিত্তিতে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু রংয়ের গোলমাল যদি ওই বোর্ডগুলির দৃশ্যমানতা কমিয়ে দেয়, তখন খুব অল্প দূরত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে গাড়ির চালককে হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাতে হয়। আর সেটা না পারলেই মুখোমুখি দুর্ঘটনার বিপদ বাড়ে। আবার দ্রুত ব্রেক কষে থেমে গেলে পিছন থেকে ধেয়ে আসা গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। ফলে পথের ধারে ওই বোর্ডগুলির চিহ্ন সংকেত গাড়ি চালক যথেষ্ট দূর থেকে দেখতে না পেলে দুর্ঘটনার বিপদ বাড়বেই। বিশেষত উচ্চগতির রাস্তায় সেই বিপদ যেমন বেশি তেমনি ধীর গতির শহরের যানবহুল রাস্তাতেও দুর্ঘটনার সেই বিপদ কম নয়। ফলে পথ নিরাপত্তায় চালককে সতর্ক করার ক্ষেত্রে যে কোনো চিহ্ন কিংবা সংকেতের রং-এর দৃশ্যমানতা নিয়ে যাচাই করতে হবে সেই রংয়ের কার্যকারিতা।

রাজনৈতিক প্রয়োজন কিংবা সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে সড়ক কিংবা সেতুতে নীল সাদা রঙের ব্যবহার বিপজ্জনক। সেই কারণেই দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য রাতের রাস্তায় fluorecent marker ব্যবহার করা উচিত রাস্তার উপরে লেনমার্কিং করতে। সাইনবোর্ড তৈরির ক্ষেত্রেও এমন fluorecent marker রাতের অন্ধকারে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বহু দূর থেকে সেটি দৃশ্যমান হয়। সে কারণে রাতের রাস্তায় মোটরবাইক আরোহীদেরও কালো পোশাকের পরিবর্তে সাদা জামা কিংবা ফ্লুরোসেন্ট রঙের জ্যাকেট পরা উচিত। এই কারণে রাস্তা নির্মাণকর্মীদের জ্যাকেটগুলিও রাতের আলোয় উজ্জ্বল দৃশ্যমান হয়। পথ নিরাপত্তা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ কিংবা সাদা রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে IRC-র বিধিতে। রাস্তার উপরে লাল রং ব্যবহার হয় দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার জন্য। সবুজ রং ব্যবহার হয় পরিবেশবান্ধব যান চলাচলের লেন চিহ্নিত করতে। গণ-পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট লেনের যাত্রী ওঠানামার অংশ চিহ্নিত করতে রাস্তার উপরে নীল রং ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি পার্কিং বিধি, নন-ওভারটেকিং জোন কিংবা রাস্তার কেন্দ্রীয় বিভাজন রেখা নিশ্চিত করতে হলুদ রঙের প্রয়োগ হয়। সাদা রঙ ব্যবহার করা হয় পথচারীদের পারাপারের স্থান, লেনমার্কিং এবং যানবাহনের স্টপ লাইন নির্দেশের ক্ষেত্রে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়ার ওপরে নির্ভর করে পথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানের রং কিংবা রঙের তন্তু নির্বাচন করা হয়। সংখ্যায় প্রচুর ভারী গাড়ির উপস্থিতির উপর নির্ভর করে থার্মোপ্লাস্টিক কিংবা কোল্ড প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবহার। এমন সামগ্রী রাস্তার লেনমার্কিং-এ ব্যবহার করা হলে রাতে গাড়িচালকদের সুবিধা হয় রাস্তার বাঁক বুঝতে। উচ্চগতির রাস্তায় বাঁকগুলি রাতের অন্ধকারে চালক বোঝে কালো পিচ রাস্তার শেষে খোদাই করা পাথরের সারি দেখে, যেগুলিকে পরিভাষায় কার্ব বলা হয়। রাতের অন্ধকারে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় যদি সেই কার্ব স্পষ্ট দেখা না যায় তখন বাঁকের মুখে গাড়ির দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। ফলে, মোদ্দা কথায় পথ নিরাপত্তায় শখের রং নয়, বরং চাই দৃশ্যমানতার নিরিখে শ্রেষ্ঠ রং কিংবা রঙের সমন্বয়। প্রশাসন কিংবা সরকারকে সেই বোধে চালিত হয়েই স্থির করতে হবে পথ নিরাপত্তার কাঙ্ক্ষিত বর্ণমালা। অন্যথায় শিয়রে সমন নিয়েই পথ চলতে হবে পথচারী থেকে চালক সবাইকেই। উমা

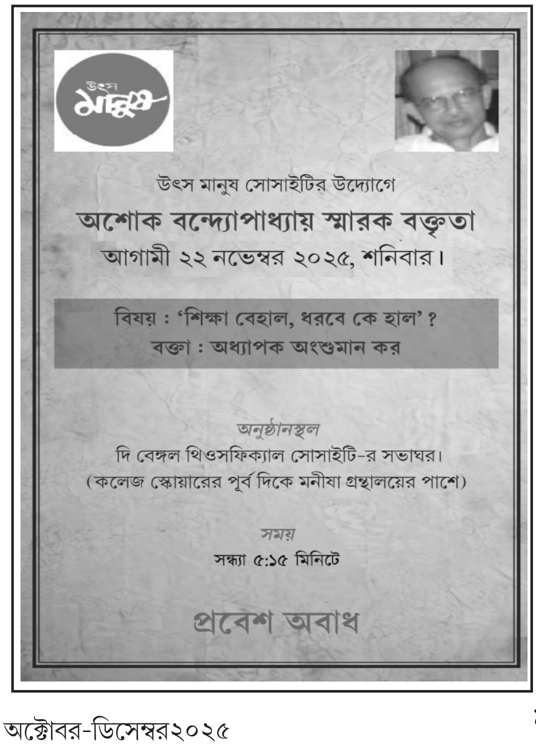

লিমেরিটনিক

অনার্য মিত্র

১.

আসুন, এবার মেতে ওঠা যাক পাড়াগত সমাধানে
পাড়াগুলো নাকি রূপবতী হবে বুথভিত্তিক দানে।
যে-বুথগুলোয় ভোট কম পড়ে
সেই ভোটারদের আনো ঘাড় ধরে,
টাকা ঢেলে তাই বোঝাতেই হবে উন্নয়নের মানে।

২.

বিরোধী দলকে ভোট দেয় যারা, তাদের ছাঁটাই করো,
ভোটার-লিস্টে 'ভুয়ো-ভিন্‌দেশি' নামে সকলকে ধরো।
ভোট-কমিশন দিলেন বিধান
'ভোট-চোর' বলে যতই চেঁচান
প্রশ্ন করুন যত খুশি, তবু পাবেন না উত্তরও।

৩.

যত নষ্টের গোড়া তবে আজ পরিযায়ী শ্রমিকেরা
তাই তো তাদের গতিপথ থাকে শত সন্দেহে ঘেরা।
কোথা থেকে তারা কোথায় যে যায়?
সব ধরা থাকে সি সি ক্যামেরায়,
প্রকৃতই তারা নাগরিক কিনা দেখা হবে চুলচেরা।

৪.

দুই নেতা করে করমর্দন, কোন্ নেতা বেশি শঠ,
বোঝা তো কিছুই যায় না সহসা সেটাই যে সংকট।
মুখোমুখি তারা যেন ভাই ভাই
হাসি ছাড়া আর কিছু জানা নাই,
হাসির আড়ালে কী যে রহস্য বুঝে নাও—ডট্ ডট্।

৫.

উন্নয়নের যতই বহর, ততই প্রকৃতি রুষ্ট
কী-বা এসে যায় সবুজ ধ্বংসে শিল্পপতিরা তুষ্ট।
তুষ্ট ওদের করতেই হবে
ভোটের টাকাটা কে জোগাবে তবে,
এই জন্যে সরকার নয়, কোনো দোষেতেই দুষ্ট।

৬.

সন্ধেবেলায় চ্যানেলে চ্যানেলে মেতে ওঠে ওরা তরজায়
এই দলনেতা চক্ষু রাঙালে, ওই দলনেতা গরজায়।
রাজনৈতিক ঝগড়াও আজ বিনোদন
মোটেই তা নয় লজ্জার, নয় অশোভন
তাদের মুখের ভাষাটাই আজ শিক্ষার নব পর্যায়। উমা

নাস্তিকের দুর্গাপুজো

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্গাপুজো কবে থেকে দুর্গোৎসব হয়ে উঠল, কেন হয়ে উঠল, এসব নিয়ে এখন দেখি খুব আলোচনা হয়। সেসব দিনক্ষণের কূট হিসেব যদি সরিয়েও রাখি, তাহলেও দুর্গাপুজো যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উজ্জ্বল প্রকাশ, এই সত্য চাপা থাকে না। প্রায় প্রথম থেকেই মানুষের মনের ভক্তি, ধর্মীয় আস্থা এসব নিয়ে সামাজিক পরিসরের রাজনীতিতে দুর্গাপুজো অন্যতম হাতিয়ার। জনমানসে প্রভাব বিস্তারের কৌশল। আজও যা সমানভাবে হয়ত বা আরও বিশেষভাবে প্রকটিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার শুধু নয়, সেই সংস্কৃতিকে কীভাবে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে পরিণত করা যায়, সে ক্ষেত্রেও দুর্গাপুজো একটা বড় হাতিয়ারের দৃষ্টান্ত। সর্বজনীন পুজোর উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের যে 'হিন্দু' হয়ে ওঠার এবং হিন্দুদের সংগঠিত করার অভিপ্রায় এবং প্রচেষ্টা দেখা যায়, এখন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হয়, তার মধ্যেই হয়ত ভবিষ্যতের দেশভাগের বীজ লুকিয়ে ছিল। এবং হয়ত আজকের হিন্দু ভারতের স্বপ্নের বীজ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তখনই বপন করা হয়ে গেছে। ধর্মীয় পরিচয় স্বয়ং দুর্গা ঠাকুরের হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় এসে দাঁড়িছে। উৎসবের আড়ম্বরের মধ্যেও কিন্তু চাপা থাকে না ধর্মীয় বিভাজনের প্রকাশ। জাতীয়তাবাদী নেতারা দেবীর সঙ্গে ভারতমাতাকে মিলিয়ে দেখার এবং দেখানোর যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, তা কি আম জনতার মধ্যে কোনও বিভাজন তৈরি করেছিল? এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা যেদিন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় নি বলেই আজও সে প্রশ্ন তার প্রাসঙ্গিকতা তো হারালোই না, বরং দিনে কালে তার

গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং বিধর্মীদের আর মূর্তির সংস্পর্শে আসাই নিষেধ। তাহলে তা ‘সর্বজনীন’ হয়ে ওঠে কী করে?

বর্ণবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেভাবে দেবীকে কুক্ষিগত করেছে, তাতে বহিরঙ্গে যত নিরীহই এবং উজ্জ্বল আলোকময় দেখাক না কেন, তার অন্তরঙ্গের সামাজিক ভূমিকা খুব নিরীহ আর থাকে না। মেয়ের পিতৃগৃহে আসা শুধু নয়, দশভূজার দশ হাতে দশ অস্ত্র। এবং সেই অস্ত্র দান করেছেন বিভিন্ন শক্তিমান দেবতা। যে অসুর বধ করে তিনি যে শান্তি স্থাপন করতে চান, তার বোধন হয় ‘পুরুষোত্তম’ রামচন্দ্রের হাতে, রাবণ বধের প্রাক্কালে। সবটা মিলিয়ে দেখলে, পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিরই জয়জয়কার। যেখানে আপামর জনসাধারণের শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি নেই। হয়ত দুর্গাপুজোকে পুজোর ঘেরাটোপ থেকে বের করে উৎসবের সামিয়ানায় এনে সামিল করার এটাও একটা কারণ।

শুভ আর অশুভের এই সামান্যীকরণ কী হিসাবে সর্বজনীন হয়ে ওঠে? যা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে শুভ, তা কী করে নিম্নবর্ণ আর বিধর্মী, (যাঁরা অবিসংবাদিতভাবে ভারতমাতার সন্তান হওয়ার দাবি রাখেন) যাঁদের মূর্তির ধারে কাছে ঘেঁষবার অনুমতি নেই, তাঁদের পক্ষেও শুভ হয়ে ওঠে? যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

রাজনীতির অভীষ্ট বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের অংশগ্রহণ যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখন দুর্গাপুজোর বহিরঙ্গেরও পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ল। দুর্গোৎসবে আপামর জনগণের মধ্যে দিয়ে বর্ণ হিন্দুর পুজোকে জাতীয় উৎসবের রূপ দেওয়া শুরু হল। শক্তি আরাধনার রূপ পরিগ্রহ করলেন দেবী। কিন্তু কোন্ শক্তি? কার শক্তি? কাকে বধ? এ সবের উত্তরে ‘অশুভ’ এই একটি শব্দ দিয়ে প্রশ্নের বিশ্লেষণ চাপা দেওয়া হল। জনমানসে যে যার মতো করে ‘অশুভ’-র সংজ্ঞা তৈরি করে নেওয়া হল।

শুভ আর অশুভের এই সামান্যীকরণ কী হিসাবে সর্বজনীন হয়ে ওঠে? যা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে শুভ, তা কী করে নিম্নবর্ণ আর বিধর্মী, (যাঁরা অবিসংবাদিতভাবে ভারতমাতার সন্তান হওয়ার দাবি রাখেন) যাঁদের মূর্তির ধারে কাছে ঘেঁষবার অনুমতি নেই, তাঁদের পক্ষেও শুভ হয়ে ওঠে? যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এবং ভূ-বৈচিত্র্যের মতো বাংলার ভূগোল এবং সংস্কৃতিতেও রঙ, রূপ, গন্ধ, স্পর্শের এক অনন্য বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সেখানে আজও রাবণের পুজো হয়। এবং সেই পুজো করেন সর্ব অর্থে সমাজের অবহেলিত নিম্ন বর্ণের দরিদ্র মানুষ। সেটি তাঁদের নিজস্ব উৎসব। নিজস্ব বিশ্বাস এবং পরম্পরা। সারা বাঙলা জুড়েই ছড়িয়ে আছেন আরও নানা দেবদেবী। ‘লোকায়ত’ তকমা দিয়ে যাঁদের খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখাই দস্তুর। স্থানীয় সাধারণের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ, প্রতিদিনের যাপনের দাবি দাওয়া নিয়েই সাধারণের দেবতা রূপ পরিগ্রহ করেন। এবং স্থানভেদে সেই রূপ নিজের মতো করেই পরিবর্তিত হয়।

আর তাই জমিদারদের চাপিয়ে দেওয়া আড়ম্বরের ঢাক বাজিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের বাইরে গিয়ে, সেই দেবতারা আজও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর প্রাপ্য পুজোটুকু পেয়ে থাকেন। দেবতাকে ঠাকুর দালান থেকে বের করে এনে, নিজেদের মাটির উঠোনে প্রতিষ্ঠিত করার মহিমা আজও সমানভাবে প্রবহমান।

একথা ঠিক যে এইসব বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা নিয়ে মানুষ উৎসবে অংশগ্রহণ করে না। বিশেষত শাসক যখন সেই উৎসবের প্রেরণা হয়ে দেখা দেন।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে সর্বসাধারণের জন্য অন্যরকম উৎসবের কথা ভেবেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ঋতু বন্দনার উদযাপনের মধ্যে দিয়ে জন্মগত ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে বাঙালির নিজস্ব আত্মপরিচয় তৈরি করতে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খল মুক্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতেই আটকে থেকেছে।

আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। প্রশ্ন করার, বিশ্লেষণ করার মন হারিয়ে ফেলেছি।

এই ঐতিহাসিক আচরণের সঙ্গত পরিণতিতেই আজ, সমস্ত বৈচিত্র্যকে মুছে দিয়ে ‘এক জাতি, এক ভাষা, এক দেশ’-এর ধারণা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণের ধর্মীয় পরিচয় এতটাই ভিন্ন এবং প্রবল রূপ নিয়েছে যে, সমস্ত একক এবং ভিন্ন কণ্ঠস্বরকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দিতে উদ্যোগী হয়েছি। হয়ত দুর্গা ঠাকুর সহায় আছেন বলেই ভুলে যাই যে সবটা এক সূত্রে বাঁধা। **উমা**

ভয়ের ভালোমন্দ

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

ভয় একটি অনুভূতি। আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এই আবেগটি নেতিবাচক বলেই সর্বজনগ্রাহ্য। যে অনুভূতি বা আবেগ মানুষের তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, তাকে আমরা নেতিবাচক বলে সংজ্ঞায়িত করি। ভয় পেলে মানুষের কিছু শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে, যেগুলি খুব স্বস্তিদায়ক বা আরামপ্রদ নয়। যেমন ধরা যাক, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠা বা পালিয়ে যাওয়া। বা অতিরিক্ত ভয়ে শরীরের কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্থানুবৎ অবস্থা। তার সঙ্গে বিবিধ আনুষঙ্গিক উপসর্গ—যেমন ঘাম, মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। এইসব উপসর্গই শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সেইজন্যেই ভয়ের অনুভূতির মন্দ প্রভাবটাই আমাদের মননের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তার যে ভালো কোনও প্রভাব থাকতে পারে, সেটি কষ্টকল্পিত। তাহলে একটি নেতিবাচক অনুভূতি মানুষ এবং কিছু মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে কেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম সঞ্চারিত হয়ে চলেছে? তাহলে কি এর কিছু ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের একটু বিবর্তনবাদ নিয়ে আলোচনায় যেতে হবে।

পৃথিবীর সব প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবণতা হল অস্বস্তিকর বা ক্ষতিকারক স্টিমুলাস বা পরিবেশকে এড়িয়ে চলা। সে এককোষী প্রাণী বা বহুকোষী প্রাণী, যেই হোক না কেন। ভাইরাসের কথা ভাবুন। সেই একরত্তি জীবটি ক্রমাগত মিউটেট করে, তার চরিত্র পাল্টে, মানুষের মতো ধুরন্ধর বুদ্ধির সঙ্গে ক্রমাগত টক্কর দিয়ে যাচ্ছে। ভাইরাসের বড় জ্ঞাতি ব্যাক্টেরিয়ার অস্ত্রভাণ্ডারে অন্তত ডজনখানেক এমন প্যাঁচ-পয়জার আছে, যা দিয়ে সে মানুষ নামক সবজান্তার তৈরি অ্যান্টিবায়োটিককেও বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। প্রাণীদের প্রতিনিয়ত এই যে পলায়নপরতা, তা কিন্তু নিজেকে আরও প্রস্তুত করার জন্য বা আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য যাতে সে প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। সে বাঁচলে তবেই না তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচবে, তবেই সেই প্রজাতি বাঁচবে। বিবর্তনবাদের 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' মতবাদের মূল দুটি নির্ণায়ক কিন্তু অভিযোজন বা অ্যাডাপ্টেশন এবং প্রজনন বা প্রোক্রিয়েশন। আর এই অভিযোজনের মূল সূত্রটি কিন্তু লুকিয়ে আছে নিজেকে পাল্টে ফেলার মাঝেই।

তাহলে মানুষের মনে যে ভয়ের অনুভূতি, তা কিভাবে বিবর্তনবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভয়ের রকমফের অভিযোজনের বিভিন্ন স্তরে মানবজাতির মজ্জাগত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়ত একটু পরিষ্কার হতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এই পৃথিবীতে আনাগোনা শুরু হয় মেসোজায়িক (২৫-৬.৫ কোটি বছর) যুগ থেকে। তখন পৃথিবী জুড়ে চলছে গড়াপেটার ভয়ঙ্কর অস্থিরতা। সমুদ্র-পাহাড় আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে। ধরণীতল তখন ভয়ানক বন্ধুর। তৎকালীন ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মগজে ঢুকলো উচ্চতার ভয় বা অ্যাক্রোফোবিয়া। উঁচু থেকে পড়ে গেলে মৃত্যু অবধারিত এবং প্রজাতির বিবর্তনে দাঁড়ি। অতএব উচ্চতাকে এড়িয়ে চলতে হবে। সর্পভীতি বা অফিডিওফোবিয়ার সূত্রপাত খুব সম্ভবত সেনোজোয়িক যুগে (৬.৫ কোটি বছর থেকে এখনও পর্যন্ত)। এই সময়েই মানুষের পূর্বপুরুষ বানর বা বনমানুষ সাপকে সঙ্গত কারণে ভয় পেতে শিখল। প্রস্তরযুগে মানুষ যখন বুঝতে শিখল যে ইঁদুর এবং অন্যান্য পোকামাকড় মনুষ্যদেহের রোগের বাহন, তখন থেকেই তাদের প্রতি ভয় হল স্বভাবজাত। তাহলে ভয়কে আপাতদৃষ্টিতে একটি নেতিবাচক অনুভূতি বলে মনে করা হলেও, সেটি কিন্তু মনুষ্যজাতির একটি সহজাত প্রবণতা যা নাকি আদতে মনুষ্যজাতির উপকারই করে এসেছে এ যাবৎ।

তবে কি মানুষের সব ভয়ের অনুভূতিই বিবর্তনের হাত ধরে সহজাত? ব্যাপারটা ঠিক অত সরল নয়। সহজ ভাষায় বললে, মানুষের মস্তিষ্কে অ্যামিগডালা বলে একটি ছোট্ট জায়গা আছে। সেখানে ভীতিকর অভিজ্ঞতার যাবতীয় ডেটা সংরক্ষিত থাকে। সে কারও নিজস্ব অভিজ্ঞতা হোক বা অপরের অভিজ্ঞতা যা নাকি আহরিত হয়েছে, সেখান থেকেই হোক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোভিড অতিমারির কথা। কেউ নিজে সংক্রমিত হয়ে ভয়ানক অসুস্থ হয়েছেন, আবার কেউ বা কোভিড সংক্রমণে অতি নিকটজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতাই মানুষকে কোভিড সংক্রমণের ভয়াবহতা মজ্জাগত করিয়েছে। ফলস্বরূপ মানুষ কোভিড সংক্রমণকে

ভয় পেতে শুরু করেছে। সহজাত ভয়ের প্রবণতা থেকে আহরিত ভয়ের আবেগ সঞ্চারিত হল মনুষ্য প্রজাতিতে। ভয় যদি অপ্রীতিকর ঘটনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মানুষের স্বাভাবিক রক্ষাকবচ হয়, তাহলে তো সেটি মানুষের সুস্থ আবেগেরই লক্ষণ। তাহলে ভয়কে নেতিবাচক আবেগ বলে মনে করা হয় কেন?

মানুষের যে কোনও আবেগ-তাড়নার সঙ্গে শারীরিক কিছু জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। ভয় মনুষ্যজাতির মধ্যে আচরণগতভাবে প্রধানত দুইভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমত, এড়িয়ে চলা বা পলায়নপরতা এবং অচলতা বা স্থবিরতা বিপদ মোকাবিলার জন্য একটি সহজাত প্রতিক্রিয়া হল বেশি শ্বাস-প্রশ্বাস (হাইপারভেন্টিলেশন) এবং হৃদস্পন্দনের হার। হাত-পায়ের রক্তনালীগুলি সংকোচনের ফলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। চোখের মণি বিস্ফারিত হয় এবং প্রতিটি লোমকূপের সাথে সংযুক্ত পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। এ ছাড়াও বেশি ঘাম হয় এবং রক্তে গ্লুকোজ ও ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শরীরের আপৎকালীন হরমোন ক্ষরণও বৃদ্ধি পায় বহুমাত্রায়। এই সবের মিলিত ফলস্বরূপ দৈনন্দিন শারীরিক এবং মানসিক আচরণেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন ধরা যাক অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, বমিবমি ভাব, শরীরে জোর না পাওয়া বা কাঁপুনি ভাব। ভয়ের অনুভূতি যদি সাময়িক হয়, তাহলে এইসব উপসর্গ ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু যদি ভয়ের অনুভূতি কোনও রোগের উপসর্গ হিসাবে শরীরে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসে, তাহলেই মুশকিল। তখন সেটি রোগের উপসর্গ হিসাবে চিকিৎসাযোগ্য হয়ে ওঠে।

শিশুমনে কিছু ভয়ের অনুভূতি সহজাত। বয়স বাড়ার সাথে সাথে, ভয়ের অনুভূতিও বাড়ে। এগারো-বারো বছর বয়সে তা সর্বাধিক হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে কৈশোর মন যুক্তি দিয়ে ভয়ের কারণ বুঝে সেগুলোকে খণ্ডাতে চেষ্টা করে। শিশু মনে যদি পরিজনের দ্বারা ভয়ের চারাগাছ প্রোথিত হয়ে যায়, তবে সে ভয়ের ভাব সমূলে উৎপাটন করা মুশকিল। যেমন ধরা যাক, শিশুদের ইঞ্জেকশনের ভয়। টীকাকরণের সময় যে ইঞ্জেকশন শিশুদের দেওয়া হয়, তার অভিজ্ঞতা প্রাথমিকভাবে ভীতিপ্রদ, কারণ এটি যন্ত্রণাদায়ক। এবারে যে কোনও কারণে শিশুটিকে যদি ক্রমাগত ইঞ্জেকশনের ভয় দেখানো হয়, তা হলে তার মনে সারা জীবনের জন্য সূঁচ ভীতি বা trypanophobia প্রোথিত হয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে ডাক্তার-আতঙ্ক বা white coat syndrome-ও। কাল্পনিক কোনও ভয়ের চরিত্রের কথা উল্লেখ করে, শিশুদের কোনও গর্হিত কাজ করা থেকে নিরস্ত করার চেয়ে, তাকে সেই কাজের কুপ্রভাব যদি তার মতো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শিশুমনে ভয়ের সঞ্চার হয় না। বরং তার মনে যুক্তির বুনন শুরু হয়। শিশুমন বিশ্লেষণধর্মী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খোলা ছাদে শিশুদের উঠতে বারণ করার জন্য একানড়ে বা ডাম্বুলুস্কি জাতীয় অদৃশ্য ভয়ঙ্কর চরিত্রের ভয় না দেখিয়ে, ছাদ থেকে পড়ে গেলে যে হাত-পা ভাঙার ভয় থাকে বা জীবন সংশয় হতে পারে, এই জিনিসটা ভালো করে বোঝানো দরকার। কাউন্সেলিং নেতিবাচক না হয়ে, ইতিবাচক হওয়াটা জরুরি।

কিছু কিছু মনোরোগের উপসর্গই হল ভয় পাওয়া। যেমন ধরা যাক উদ্বেগ ব্যাধি বা anxiety disorder। অ্যাগোরাফোবিয়া (agoraphobia) হল এমন একটি রোগ, যেখানে আক্রান্ত মানুষটি কোনও একটি বিশেষ অবস্থানে বা পরিবেশে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যেমন ধরা যাক, অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ রাখা বা আটকে পড়ার ভয়ে লিফ্‌টে না চড়া বা মাকড়সার ভয়ে বন্ধ ঘরে বা বাগানে না যাওয়া। panic disorder বা তীব্র আতঙ্কের শিকার হয়ে পড়াটাও এক ধরনের মানসিক ব্যারাম। এখানে রোগী কয়েক মিনিটের জন্য তীব্র আতঙ্কের শিকার হন, যেটি নাকি মৃত্যুভয়ের সমতুল। social anxiety disorder হল এক ধরনের সামাজিক আতঙ্ক, যেখানে হয়ত কেউ জনসমক্ষে ভাষণ দিতে বা অভিনয় করতে গিয়ে ভয়ের শিকার হচ্ছেন। আধুনিক সমাজজীবনে দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক বৈকল্য বা post traumatic stress disorder একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ব্যাধি। যৌন নির্যাতন বা পথ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত বা যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক বিকার বেশি দেখা যায়। তারা দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মের থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখে আতঙ্কের মধ্যে দিন গুজরান করে। বিচ্ছেদ উদ্বেগ বা separation anxiety হল শিশুদের মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক ভয়ের অনুভূতি। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন তাঁর প্রিয়জন বিচ্ছেদের আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন সেটি ব্যাধি বা disorder হিসাবে চিকিৎসাযোগ্য হয়ে পড়ে। অনুরূপে অসুস্থতার আশঙ্কাজনিত কারণে যদি কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন, সেটিকে পরিভাষায় বলা হয় illness anxiety disorder। সুতরাং ভয়

যতক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া, ততক্ষণ সমস্যা নেই, যেই মুহূর্তে সেটি রোগের উপসর্গ, তখনই ব্যাপারটি জটিল হয়ে ওঠে। শেষ করা যাক ভয়ের অনুভূতির কিছু ইতিবাচক দিকের আলোচনা দিয়ে।

ভয়কে সাধারণত আমরা একটি নেতিবাচক আবেগ হিসেবে দেখি। কিন্তু এই শক্তিশালী অনুভূতির কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে, যা আমাদের জীবনকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।

১. সুরক্ষা ও আত্মরক্ষার মাধ্যম (Survival Mechanism)—ভয় হল আমাদের সবচেয়ে প্রাথমিক এবং শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা। এটি বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে। যখন আমরা কোনো বিপদ দেখি বা অনুভব করি, আমাদের মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ 'লড়াই অথবা পালানোর' (fight or flight) প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এই প্রতিক্রিয়া আমাদের শরীরকে দ্রুত প্রস্তুত করে তোলে—হৃদস্পন্দন বাড়ে, পেশি শক্ত হয়, এবং আমরা বিপদের মোকাবিলা করতে বা সেখান থেকে সরে যেতে পারি। ভয় না থাকলে আমরা অনেক বিপদকে গুরুত্ব দিতাম না, যা আমাদের জীবন বিপন্ন করতে পারত।

২. সচেতনতা বৃদ্ধি— ভয় আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তোলে। একটি নতুন জায়গায় গেলে বা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় হাল্কা ভয় আমাদের সতর্ক থাকতে সাহায্য করে। এই সচেতনতা আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখে এবং অপ্রত্যাশিত সমস্যা এড়াতে সাহায্য করে।

৩. মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি— সামান্য ভয় বা উদ্বেগ আমাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়াতে পারে। পরীক্ষার আগে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশনের আগে যে ভয় কাজ করে, তা আমাদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে। এই ধরনের ভয় আমাদের মনোযোগকে তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং কাজটিকে আরও নিখুঁতভাবে শেষ করতে সাহায্য করে।

৪. সাহস ও আত্মবিশ্বাস বিকাশে সাহায্য— ভয়কে জয় করার অভিজ্ঞতা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। যখন আমরা আমাদের ভয়কে মোকাবিলা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মধ্যে সেই ভয়কে অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে। এই উপলব্ধি আমাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

৫. সহানুভূতির বিকাশ— অনেক সময় আমরা অন্যদের ভয়ের প্রকাশ দেখে তাদের পরিস্থিতি বুঝতে পারি। এটি আমাদের মধ্যে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার অনুভূতি তৈরি করে। অন্যের ভয় বা দুর্বলতা বোঝা আমাদের সম্পর্ককে গভীর এবং আরও মানবিক করে তোলে। সুতরাং ভয় শুধু একটি দুর্বলতা নয়, বরং এটি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ যা আমাদের সুরক্ষিত রাখে, সতর্ক করে এবং একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র :

UPTODATE:Specific phobia in adults: Epidemiology, clinical manifestations, course, and diagnosis-AUTHOR:Randi E McCabe, Phd SECTIONEDITOR: Murray B Stein, MD, MPH DEPUTYEDITOR: Michael Friedman, MD

ভয়: উইকিপিডিয়া

ভয়: উৎস মানুষ - অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

উমা

আইআইটি সিলেবাসে জন্মান্তরবাদ

দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। আইআইটি মান্ডি আইআইটি-তে সিলেবাসে পুনর্জন্ম ও আত্মার অস্তিত্ব ঢুকে পড়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে বিজ্ঞান চর্চার এই হাল দেখে শিক্ষক ও বিজ্ঞান গবেষকমহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাঁদের সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া পিপলস্ সায়েন্স নেটওয়ার্ক (এআইপিএসএন) একটি আবেদনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মান্ডি আইআইটি ছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসে ভূতপ্রেত-এর চর্চা জায়গা করে নিয়েছে। এআইপিএসএন শিক্ষকদের শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এমন সব বিষয় নিয়ে যাতে চর্চা করা হয় সেদিকে নজর রাখতে বলেছেন। খড়্গপুর আইআইটিতে ভারতীয় সভ্যতা আসলে তুষার যুগের ঢের আগে এমন দাবি করা হচ্ছে।

সূত্র — দ্য টেলিগ্রাফ। ১৩ আগস্ট ২০২৪

দানপুণ্য

দীপাবলী সেন

দান একটি পুণ্যকর্ম বলে আমাদের দেশে স্বীকৃত। পিতার দানদক্ষিণা দেবার বহর দেখেই কঠোপনিষদে বালক নচিকেতার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাকে পিতা কার কাছে দান করে দিচ্ছেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে বিখ্যাত সেই উপদেশ : শ্রদ্ধয়া দেয়ম। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম। এর পরের উপদেশ দুটি একটু কম প্রচলিত, কিন্তু আছে : শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম। সংবিদা দেয়ম।

দান হেলাভরে করতে নেই, গ্রহীতার প্রতি মর্যাদা ও সহানুভূতি এমনকি ভীতি সহকারে করা উচিত। ভীতিটা এইজন্য যে, সসম্ভ্রমে কাজটি না করলে দাতা নিজে একটি পুণ্য অর্জন করার সুযোগ হারাবে, এমনকি অভিশপ্তও হয়ে যেতে পারে।

সেই ঔপনিষদিক কাল থেকে এই ধারণাটি অধিকাংশ ভারতবাসীর মনে প্রচলিত আছে। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে, রামায়ণ রচিত হত না যদি সীতা রাবণকে ভিক্ষা দান করতে না যেতেন। কর্ণার্জুনের মধ্যে কে জয়ী হবেন তার নিষ্পত্তি অন্যরকম হত যদি 'দাতা' কর্ণ ইন্দ্রকে তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডলটি ভিক্ষা দিয়ে না বসতেন। আবার, যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে গ্লানি দূর করতে বেদব্যাসের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সামন্ত রাজাদের থেকে সংগৃহীত ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে দান করে দেন।

কৃষ্ণ বরং দান ব্যাপারটা একটু বিচার বিবেচনা করে করতে বলেছিলেন। ঠিক লোককে ঠিক সময়ে ও ঠিক জায়গায় দান করলে সেটাই হয় সাত্ত্বিক দান। কেউ কোনো উপকার করে দেবার পরিবর্তে বা কোনো কাজে আসবে বলে বা কারও প্রতি বাধ্য হয়ে যে দান করা হয়, তা রাজসিক দান। অপাত্রে অস্থানে অসময়ে যোগ্য সমাদর না করে যে দেন, তা নিতান্তই তামসিক (শ্রদ্ধা-ত্রয়-বিভাগ-যোগ, গীতা, ১৭অধ্যায়)। মনুও একই কথা বলে গেছেন।

কিন্তু এই বিচার বা জাজমেন্ট ছাড়াই বেশিরভাগ সময়ে আমরা দান করে থাকি।

রাস্তার মোড়ে, ফ্লাইওভারের তলায়, কি দোরগোড়ায়। গেরুয়া বা জর্দা রঙের জটাধারী আসে, কখনো বা গলায় ক্লান্ত একটি সাপ জড়িয়ে, বিরক্তি সহকারে হলেও আমরা অনেকেই তাকে কিছু একটা দিয়েই ফেলি। আজও।

১৬০১ সালেই কিন্তু অত্যন্ত বিপরীতমুখী একটা ধারণা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। রানী প্রথমা এলিজাবেথ ইংল্যান্ডে ঐ সনে চালু করেন তাঁর '৪৩র্ড এলিজাবেথ' নামক আইন—ভিক্ষা করার বিরুদ্ধে। তার মর্মে আছে এই কথা—লোকে ভিক্ষা যে করে থাকে সেটা নেহাৎই তারা আলসে বা ভবঘুরে বলে।

'অক্ষম দরিদ্র' (ইম্পোটেন্ট পুওর) ছাড়া সবাইকে জেলে পুরে দেওয়া হবে, তাদের মারধর করা হবে, এমনকি শারীরিক নির্যাতন। রাজা অষ্টম হেনরি তাঁর দেশকে ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টান্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা দেশে নিয়ে এলেন এই 'পুরনো দারিদ্র্য আইন' (ওল্ড পুওর ল)। কিন্তু চ্যারিটি বা দয়াদাক্ষিণ্য তো খ্রিস্টান ধারণার এক প্রধান অঙ্গ? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা গির্জাঘরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দাক্ষিণ্য (অর্গানাইজড চ্যারিটি)।

ব্যক্তি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা চাইছে, এটা ঐ চিন্তাধারায় নিন্দিত। আগেও ছিল, প্রথমা এলিজাবেথ সেটা নিয়মে বেঁধে দিলেন। তারপর ...এল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এল ইন্ডআস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন, এল পলাশীর যুদ্ধ, এল সিপাহী বিদ্রোহ, এল ব্রিটিশ এম্পায়ার।

১৮৩৪-এ ইংল্যান্ডে 'নিউ পুওর ল' বা নয়া দরিদ্র কানুন চালু হয়ে গেল। মৃত্যুর প্রান্তে না এলে, মানুষ সরকারি সাহায্য পাবে না, এবং যা পাবে তা কাজ-ঘর (ওয়ার্ক হাউস)-এ যেতে বাধ্য না হলে তবেই। কাজ-ঘর ব্যবস্থাটি দরিদ্র ইংল্যান্ডবাসীর কাছে শ্রীঘরেরই নামান্তর ছিল। মার্ক্স এবং সিডনি ও বেয়াত্রিসে ওয়েব এটির বহু নিন্দা করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ হলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি এটিরই ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন ফ্যামিন কমিশন-এর তাই বিধান হত।

বিশ্বযুদ্ধ দুটির সময় থেকে, ইউরোপ ও আমেরিকায় দারিদ্র্য সম্বন্ধে চিন্তাভাবনায় একটা পরিবর্তন হল। একটা বোধ বা চৈতন্য হল যে এমনও হতে পারে যে প্রকৃতিগতভাবে অলস

বা ভবঘুরে বলে নয়, মানুষ চাকরি করছে না কারণ চাকরি পাচ্ছে না, কারণ দেশে চাকরি নেই। গ্রেট ডিপ্রেশন এল। একাধিক দেশ মহাবিষাদ-যোগে আচ্ছন্ন হল।

১৯৩০-এ লর্ড কিনস্ একটা আশার কথা বললেন। লিখলেন সরকারের এক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা আছে, সামন্ততান্ত্রিক যুগের থেকে অনেক বড় কাঠামোয় বা স্কেলে। অর্থনীতি তত্ত্বের দৃষ্টিতে দান হল আয়ের অর্জন নয়, হাত-বদল, 'ট্রান্সফার ইনকাম' মাত্র। ন্যাশনাল ইনকাম বা গ্রস ডোমেস্টিক ইনকাম-এর মধ্যে যেটা আসে না। কোনো কিছু না করেই যা পাওয়া যায়, তা তো উৎপাদক কার্য বা প্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তাই দানদক্ষিণার মাধ্যমে কোনো আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কীনস-এর কথা মতো কিন্তু সরকারি দান উৎপাদনমূলক কাজে গেলে দেশের আয় ক্রমশ ধাপে ধাপে বেড়ে যেতে পারে। সংক্রামিত হতে পারে এক থেকে আর-এক ক্ষেত্রে। 'মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট' প্রতিক্রিয়া হতে পারে সরকারের এককালীন বদান্যতার।

১৯৪১-এ বসল বেভেরিজ কমিটি। ইংল্যান্ডে যুগান্ত এল ওয়েলফেয়ার স্টেট-এর রূপে। আরও কত বদলাতে লাগল দিন। দেশে দেশে। আণবিক বিস্ফোরণ হল। 'স্বাধীনতা' পেলাম আমরা।

সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিকতা কিন্তু দান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক সময়কার ধারণাটিকে বিশেষ টাল খাওয়াতে পারে নি। এত যোজনা, এত নীতিতেও না। কিছু বদল এসেছে নিশ্চয়। ফুড ফর ওয়ার্ক থেকে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিম কতরকম প্রকল্প যা 'কেএনসিয়ান ইকনমিক্স'-এর উপরই আধারিত। তবু ব্যক্তিগতভাবে আমরা কতটা আস্থা রাখছি, আর কেনই বা রাখব। পরিসংখ্যান যাই বলুক, আমরা তো দেখছি, চারদিকে হাত পাতা, মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের চেয়ে অনেক বেশি।

আমার ফিজিওথেরাপিস্ট মেয়েটি কথায় কথায় বলল, লালবাতিতে গাড়ি থামতে, দুটি বালক-বালিকা এসে ওর জানালায় ভিক্ষা চাইল। এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হলেও, সেদিন কি মনে হওয়ায় ও তাদের বলল, চল ওই পথের পাশের 'ধাবা'তে তোমাদের খাইয়ে দিচ্ছি। 'নহিঁ, হমে ব্যস পয়সে চাহিয়ে' বলে তারা অন্য গাড়িতে দে ছুট! হয়ত ওদের কারো (কার বা কাদের?) মার খেতে হবে যথা পরিমাণ রোজগার করে না আনতে পারলে। এ তো নতুন কিছু না। ডিকেন্স তাঁর *অলিভার টুইস্ট*-এ লিখে গেছেন সেই ১৮৩৯-এ।

বিখ্যাত (যদিও সম্প্রতি বিগত) হাস্যশিল্পী (স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান) একাধিক মঞ্চে এই ভিক্ষাজীবীদের নিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন, তাঁরা মুম্বাই-এ একদিকে ভিক্ষা করছেন অন্যদিকে স্মার্টফোনে বার্গার আনিয়ে খাচ্ছেন। 'বাবা'রা ধমকের সুরে ভিক্ষা আদায় করে নিচ্ছেন।

তরুণীরা পেটে পোঁটলা বেঁধে সদ্য প্রসব বেদনা উঠেছে বলে অর্থ সাহায্য চাইছে, টাকাটা দিলে নিজেরাই চলে যেতে পারবে বলছে। কোলে হাত-পা কাঠি রোগা ছেলের জন্যও দুধ বা রুটি নয়, কাঁচা টাকাই চাইছেন।

এত দেখছি, এতদিন ধরে দেখছি, দেখেও দেখছি না, আবার ভেতরে ভেতরে একটা খচ্‌খচ্‌ও করছে। পুণ্যকর্ম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলাম না তো? দিয়ে দিলেই তো হত কিছু খুচরো?

কোথাও কোথাও আবার দেখেছি ভিক্ষাপাত্রে স্ক্যানার বসানো থাকছে। খুচরো নেই বললে চলবে না। শ্রদ্ধাপূর্বক পাত্রাপাত্র বিচারপূর্বক দান চলন্ত গাড়ি থেকে করার ফুরসৎ কোথায়?

সীতার সময়েও ছিল না। এই বিচার করার মনোভাবটাই আমাদের নেই। কারণ সাধারণ মানুষ আমরা দানটা করি, বেশিরভাগ সময়েই করি নিজেদের জন্য। নিজেদেরকে একটু পুণ্য পাইয়ে দেবার জন্য। যাকে দিচ্ছি তার জন্য ততটা নয়। না, শ্রদ্ধায় না, বিচার বিবেচনায় তো নয়ই, বরং আমরা দান করি যুগ-যুগ ধরে চলে আসা একরকমের সংস্কারবশত।

ভেবে দেখতে হয়, সেটা কুসংস্কার না তো??

উমা

২০২৪-এ দেশের ১৮,২০০ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস

গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (জিএফডব্লু)-এর তথ্য জানা গেল ২০২৪-এ দেশের আর্দ্র বনভূমির ১৮,২০০ হেক্টর ধ্বংস হয়েছে। আরো জানা গেল ২০০২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে দেশ আর্দ্র বনভূমির প্রায় ১৫ ভাগ (৩,৪৮,০০০ হেক্টর) হারিয়েছে।
সূত্র— দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মে ২২, ২০২৫

কৃষ্ণগহ্বর — অপার বিস্ময় আর বিজ্ঞান

সপ্তর্ষি ব্যানার্জী

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।'...

অপার অনন্ত মহাবিশ্বে বিস্ময়ের অন্ত নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানের অপরিসীম অগ্রগতি মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং তাদের কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছে। নিউটনের বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্র, কেপলারের সূত্রাবলী মহাবিশ্বের বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের বিজ্ঞান চেতনাকে বহুগুণ এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে, মহাকর্ষের কারণ ব্যাখ্যা, মহাকর্ষজনিত ঘটনাবলীর বর্ণনাসহ আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের। তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বা জেনারেল রিলেটিভিটি তত্ত্ব মহাকাশ বিজ্ঞানের জগতে এক অসামান্য অবদান। যে তত্ত্ব অনুযায়ী, বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্রহ ও অন্যান্য সেলেস্টিয়াল বস্তু কর্তৃক টাইম স্পেস বা স্থানকালের বক্রতাই হল মহাকর্ষের কারণ।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন রহস্যের মধ্যে, একটি গভীর রহস্যের নাম কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল।

কৃষ্ণগহ্বর কি এবং তার সৃষ্টি কিভাবে হয়? — এটা বুঝতে গেলে আগে জানতে হবে, এই মহাবিশ্বের নক্ষত্রদের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তাদের পরিণতি কি হয়। জ্বালানিহারা নক্ষত্রদের পরিণতি নির্ভর করে তাদের ভরের উপর। ছোট থেকে মাঝারি মাপের নক্ষত্র, জ্বালানি শেষ হলে প্রথমে রেড জায়েন্ট বা লাল দানব এবং তারপর বাইরের অংশ ছেঁটে ফেলে ভেতরের কোর অংশটা হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামনে পরিণত হয়। লক্ষ কোটি বছর পর সেই শ্বেত বামন উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ বা কালো বামনে পরিণত হয়। অন্যদিকে বৃহৎ নক্ষত্রদের পরিণতি হয় আলাদারকম। জ্বালানি শেষ হলে প্রথমে তারা রেড সুপারজায়েন্টে পরিণত হয়, তারপর বিশাল সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে বাইরের অংশ ঝেড়ে ফেলে ভেতরের অংশটি জন্ম দেয় নিউট্রন স্টার অথবা আরো বড় নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক হোলের।

ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি বোঝার জন্য বুঝতে হবে গ্র্যাভিটেশনাল কোল্যাপ্স কাকে বলে। কোনো নক্ষত্রের কণাগুলির প্রবল মহাকর্ষ এবং নক্ষত্রর অন্তর্বর্তী চাপের সাম্যাবস্থা সেই নক্ষত্রটিকে স্থিতিশীলতা দেয়। এই চাপ তৈরি হয় নক্ষত্রের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রবল শক্তির কারণে। নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী জ্বালানি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন এই অন্তর্বর্তী চাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তখন কণাদের পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের প্রভাবে নক্ষত্রটি সঙ্কুচিত হতে থাকে।

প্রবল সঙ্কোচনের ফলে নক্ষত্রটির বিশাল ভর অতি সামান্য স্থানে পুঞ্জীভূত হয়। এই জ্বালানি হারানো সঙ্কুচিত হতে থাকা নক্ষত্রটি অবশেষে সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর পরিণত হয় নিউট্রন স্টার বা কৃষ্ণগহ্বরে। নিউট্রন স্টারে নিউট্রন কণারা অতি ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে। এতে এক ধরনের অন্তর্বর্তী চাপ তৈরি হয়, যাকে বলা হয় ডিজেনারেসি প্রেশার। এই চাপ নিউট্রন স্টারের কমাগুলির প্রবল মহাকর্ষকে প্রতিহত করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। কিন্তু নিউট্রন স্টারের ভর যদি সূর্যের ভরের তিন গুণ বা তার চাইতে বেশি হয়, তখন এই ডিজেনারেসি প্রেশার নক্ষত্রের কণাগুলির প্রবল মহাকর্ষকে প্রতিহত করতে পারে না। গ্র্যাভিটেশনাল কোল্যাপ্স ঘটে। মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রটি সঙ্কুচিত হতে হতে পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। যদিও, এই 'সূর্যের ভরের তিন গুণ'—এটি ওভার এস্টিমেশন, সূর্যের ভরের দ্বিগুণ ভরসম্পন্ন নক্ষত্র থেকেও কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হতে পারে।

কৃষ্ণগহ্বরে অতি স্বল্প স্থানে পুঞ্জীভূত বিশাল ভরের মহাকর্ষ এত প্রবল হয় যে তার কাছে এসে পড়া কোনো বস্তুই সেই আকর্ষণ অতিক্রম করে বেরোতে পারে না। এমনকি আলোর কণাও সেই প্রবল মহাকর্ষকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই কারণেই কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল বলা হয়।

এই ব্যাপারে বুঝতে গেলে আগে বলা দরকার মুক্তিবেগের বিষয়ে। মুক্তিবেগ কাকে বলে? আগে পৃথিবীর নিরিখে বোঝা যাক। কোনো বস্ত যে বেগ প্রাপ্ত হলে পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র ছেড়ে বেরোতে সক্ষম হবে তাই হল পৃথিবীর সাপেক্ষে মুক্তিবেগ। তেমনই অন্য কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রের

সবারই মুক্তিবেগ আছে। কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগের মান আলোর বেগের চেয়েও বেশি, তাই আলো কৃষ্ণগহ্বরের নিকটে এসে পড়লে আর বেরোতে পারে না।

এই নিকট বলতে কতটা নিকট? কৃষ্ণগহ্বরের কত কাছে এসে পড়লে আলো সহ যে কোনো কণা আর বেরোতে পারে না? এটিকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্ত। এই ইভেন্ট হরাইজনের মধ্যে কোনো বস্তু ঢুকে পড়লে তা চিরতরে কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এই ইভেন্ট হরাইজনের নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ আছে। দুই ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। একটিকে বলা হয় সোয়ার্ৎজশিল্ড কৃষ্ণগহ্বর, আরেকটি হল কার-নিউম্যান কৃষ্ণগহ্বর। সোয়ার্ৎশিল্ড কৃষ্ণগহ্বরের ইভেন্ট হরাইজনের ব্যাসার্ধ $R_s=2GM/c^2$, যেখানে G-মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M-কৃষ্ণগহ্বরের ভর, C-আলোর বেগ।

এবার আসা যাক, সোয়ার্ৎজশিল্ড এবং কার-নিউম্যান কৃষ্ণগহ্বর কোথায় আলাদা সেই প্রসঙ্গে। সোয়ার্ৎজশিল্ড কৃষ্ণগহ্বরের কোনো চার্জ বা তড়িৎ আধান নেই, এবং এটি ঘূর্ণায়মান নয়। একে একমাত্র ভর দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়। অপরদিকে কার-নিউম্যান কৃষ্ণগহ্বর হল, কৃষ্ণগহ্বরের সাধারণ ব্যাখ্যা, যেখানে ভরের পাশাপাশি কৃষ্ণগহ্বরের চার্জ আছে এবং এটি ঘূর্ণায়মান, অর্থাৎ কৌণিক ভরবেগও বর্তমান। অর্থাৎ সোয়ার্ৎজশিল্ড কৃষ্ণগহ্বর হল একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে চার্জ ও কৌণিক ভরবেগ শূন্য।

ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনকে ঘিরে আবার একটি স্থান থাকে যাকে আর্গোস্ফিয়ার বলা হয়। এই আর্গোস্ফিয়ার সবচেয়ে চওড়া হয় গোলাকার ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের মধ্যের অংশে বা ইকুয়েটর অঞ্চলে। যত দুই মেরুর দিকে যাওয়া যাবে, আর্গোস্ফিয়ার সরু হতে থাকে এবং দুই মেরুতে আর্গোস্ফিয়ার ইভেন্ট হরাইজনে মিশে যায়। এই আর্গোস্ফিয়ারের মধ্যে কোনো বস্তু এসে পড়লে তা কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণন গতিতে ঘুরতে শুরু করে এবং কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণনশক্তির থেকে শক্তি লাভ করে। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী পেনরোজের তত্ত্ব অনুযায়ী আর্গোস্ফিয়ারে ঘূর্ণায়মান বস্তু দুটি টুকরো হয়ে একটি টুকরো ব্ল্যাকহোলের ভেতরে আরেকটি টুকরো বাইরের দিকে ছিটকে যায়। বাইরের দিকে ছিটকে আসা বস্তুর অংশটি অতি উচ্চ গতিশক্তিসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ বস্তুটি যে শক্তি নিয়ে আর্গোস্ফিয়ারে প্রবেশ করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি আর্গোস্ফিয়ারের বাইরে বেরিয়ে আসে বস্তুর অংশটির সঙ্গে। এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণন শক্তি ক্ষয় হয়। ঘূর্ণন শক্তি কমতে কমতে একসময় শূন্য হয়ে পড়লে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলটি কার্যত একটি সোয়ার্ৎজশিল্ড ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়।

ব্ল্যাকহোলের ধারণার সূচনালগ্ন থেকে সাধারণ মানুষের মনে যে প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তা হল, ব্ল্যাকহোলের ভেতরে কি আছে? মহাকাশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু বা ঘটনা আবিষ্কারের মূল সহায়ক হল সেখান থেকে ভেসে আসা আলো বা তরঙ্গ। আলো বা তরঙ্গের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বহু আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু ব্লাকহোলের ভেতর থেকে আলোর মুক্তি সম্ভব নয়। তাই ব্ল্যাকহোলের ভেতরের অবস্থা সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের ভেতরে যে ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। প্রবল মহাকর্ষের প্রভাবে স্পেস টাইম সাঙ্ঘাতিকভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ফিজিক্স-এর সবরকম সূত্র ও নিয়মাবলী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থার পরবর্তী অবস্থা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের থেকে বহু দূরত্বে থাকা কোনো পর্যবেক্ষকের পক্ষে ব্ল্যাকহোলের ভেতরের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের মতে, ব্ল্যাকহোলের অন্তর্বর্তী গ্র্যাভিটেশনাল কোল্যাপ্সজনিত সিঙ্গুলারিটি ব্ল্যাকহোলের বাইরের কোনো পর্যবেক্ষককে দেখতে দেয় না ইভেন্ট হরাইজেন। এই তত্ত্বের নাম—'কসমিক সেন্সরশিপ কনজেকচার।'

ব্ল্যাকহোল কি সম্পূর্ণভাবেই ব্ল্যাক? এর থেকে কি কোনো কিছুই বিকিরিত হয় না? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করেছিলেন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। এই প্রশ্নের সমাধানে তিনি প্রয়োগ করেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানই শূন্য নয়। সেখানে অসংখ্য কাল্পনিক পার্টিকল এবং অ্যান্টিপার্টিকল সৃষ্টি হয় এবং খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই তারা একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে অবলুপ্ত (অ্যানিহিলেটেড) হয়। অর্থাৎ মোট ফলাফল শূন্য বা ভ্যাকুয়াম। ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার শূন্যস্থান আর কোয়ান্টাম শূন্যস্থানের ধারণা তাই আলাদা।

ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের চারপাশের শূন্যস্থানে এরকম অসংখ্য পার্টিকল ও অ্যান্টিপার্টিকল অনবরত সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। ধরা যাক, এই কণাদ্বয়ের একটির শক্তি

পজিটিভ E, আরেকটির শক্তি সমপরিমাণ নেগেটিভ -E, ফলস্বরূপ মোট শক্তি শূন্য। এবার ঐ শূন্যস্থানে সৃষ্টি পার্টিকল ও অ্যান্টিপার্টিকল-এর ভবিতব্য বিভিন্ন রকম হতে পারে।

প্রথম সম্ভাবনা—কণাদ্বয় সৃষ্টি হয়ে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে ইভেন্ট হরাইজনের বাইরেই ধ্বংস হয়ে গেল।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা—এই কণাদ্বয়ের একটি পজিটিভ শক্তি E নিয়ে ব্ল্যাকহোলের থেকে দূরে বেরিয়ে এল, আরেকটি নেগেটিভ শক্তি -E নিয়ে ব্ল্যাকহোলের ভেতরে প্রবেশ করল।

তৃতীয় সম্ভাবনা— কণাদ্বয়ের একটি নেগেটিভ শাক্তি -E নিয়ে বাইরের দিকে এল, আর অপরটি পজিটিভ শক্তি E নিয়ে ব্ল্যাকহোলের ভেতরে প্রবেশ করল।

চতুর্থ সম্ভাবনা— কণাদ্বয় সৃষ্টি হল এবং পার্টিকল ও অ্যান্টিপার্টিকল দুটিই ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে নিক্ষিপ্ত হল।

স্টিফেন হকিং জটিল গণনা করে জানালেন যে, দ্বিতীয় ঘটনাটির সম্ভাবনা সর্বাধিক। অর্থাৎ বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে এটাই অনুধাবিত হবে যে, ব্ল্যাকহোল থেকে শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। একেই বলে হকিং রেডিয়েশন।

যদিও বর্তমানে যেসব ব্ল্যাকহোল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়, সেগুলো থেকে হকিং রেডিয়েশন-এর পরিমাণ অতি সামান্য। প্রাইমরডিয়াল ব্ল্যাকহোল অর্থাৎ যেগুলো বিগ ব্যাং বা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির লগ্নে সৃষ্ট ব্ল্যাকহোল সেগুলো থেকে হকিং রেডিয়েশন-এর সম্ভাবনা ও পরিমাণ অধিক ছিল, যদিও তার বেশিরভাগটাই বর্তমানে অবলুপ্ত। তবে হকিং রেডিয়েশনের তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কিত অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারণার জন্ম দিয়েছে।

ব্ল্যাকহোলের মধ্যে থেকে আলো নির্গত হতে পারে না। এহেন মহাজাগতিক ভরপিণ্ডের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার উপায় কি? উপায় হল কৃষ্ণগহ্বরের প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবজনিত বিভিন্ন ঘটনার অনুধাবন ও বিশ্লেষণ। এমনই একটি ঘটনা ঘটে বাইনারি স্টার সিস্টেমের (কাছাকাছি অবস্থিত দুটি নক্ষত্র) একটি যদি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। ব্ল্যাকহোলটির প্রবল আকর্ষণে বাইনারি স্টার সিস্টেমের অপর নক্ষত্রটির থেকে পদার্থ ব্ল্যাকহোলটির দিকে ধাবিত হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় অ্যাক্রিশন। এই সব ধাবিত পদার্থ কৃষ্ণগহ্বরটির চারপাশে বলয়ের মতো ডিস্ক তৈরি করে, যাকে অ্যাক্রিশন ডিস্ক বলে। এই অ্যাক্রিশন ডিস্কের পদার্থসমূহ ঘর্ষণের ফলে প্রবল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেখান থেকে শক্তির বিকিরণ ঘটে। অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে মূলত এক্স-রে বিকিরিত হয়। এই ধরনের এক্স-রে বিকিরণের উৎসগুলি ব্ল্যাকহোলের পরোক্ষ প্রমাণ দেয়। সিগনাস এক্স-1। এই ধরনের এক্স-রে বিকিরণকারী বাইনারি স্টার সিস্টেমের উদাহরণ।

এছাড়া ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষের কারণে আলোর পথের বক্রতা জনিত গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিংও আরেকটি পরোক্ষ প্রমাণ।

আবার দুটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষে সৃষ্ট গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ, যা লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি বা লাইগো (LIGO)-র মাধ্যমে শনাক্তকরণ করা যায় তাও পরোক্ষ প্রমাণ জোগাতে সাহায্য করে। এছাড়া কোনো অদৃশ্য বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রে ব্ল্যাকহোলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন ও তার ভর ও সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

সর্বোপরি, ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ সিস্টেমের সাহায্যে সুপারম্যাসিভ ব্লাকহোলের ছায়া বা শ্যাডো, ইভেন্ট হরাইজনের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রত্যক্ষ ভিস্যুয়াল প্রমাণ পাওয়া গেছে---যেমন M87 গ্যালাক্সির কেন্দ্রের সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল ও আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল স্যাজিটেরিয়াস-এ এগুলির ছবি প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০১৯ ও ২০২২ সালে।

সবশেষে বলি, মহাকাশ মানুষকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে, বিস্মিত করেছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের জগতে অনেক কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার হলেও এখনও অনেক কিছু জানার বাকি রয়ে গেছে। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর, যা একসময় ছিল চরম বিস্ময়, তার সম্পর্কে বেশ কিছু জানা গেলেও, অজানা রয়ে গেছে অনেক তথ্য, অনেক ঘটনা। অনুসন্ধিৎসু ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের খোঁজ তাই চলতেই থাকবে।

তথ্যসূত্র :

1. Black Holes, Jayant Narlikar.
2. Internet

উমা

বুকে ব্যথা!

গৌতম মিস্ত্রী

ইদানীংকালে খবরের কাগজে কিশোর-কিশোরী আর তরুণ-তরুণীদের হৃদরোগে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর খবরে বিচলিত, অনেক সুস্থ সচেতন মানুষ নাচার হয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের ক্লিনিকে হাজির হচ্ছেন কাজ কামাই করে। তাঁদের বেশিরভাগ এতদিন খোশ মেজাজে ভালোই ছিলেন, খবরের কাগজে কম বয়সীদের আকস্মিক মৃত্যুর খবরের নাটকীয় পরিবেশনায় কিঞ্চিৎ ভ্রূ কোঁচকালেন। তারই সঙ্গে সঙ্গত দিয়ে, খবরের মোড়কে পোরা, কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের ছদ্ম বিজ্ঞাপন ভার্চুয়াল মৃত্যুর পরোয়ানা দিচ্ছে আজকাল। তার ইঙ্গিতে বুঝি বা সুস্থ নাগরিকদের সুস্থির মেজাজ বশে রাখা দায় হল। ছদ্ম বিজ্ঞাপন যা একটি 'বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদকীয় বা সংবাদ নিবন্ধের শৈলীতে' একটি পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপন ছাপে টাকার বিনিময়ে (advertorial)। হার্ট অ্যাটাক হল কী? কিংবা হার্ট ব্লক, নাকি হার্টের ভাল্ব ব্লক? হার্ট ফেলিওরের কথাও শোনা যায়। খবরটা শোনার পর থেকেই বুকে কেমন ব্যথা ব্যথা করছে বলে মালুম হচ্ছে। হার্ট তো বুকের বাম দিকে থাকে। কিন্তু বুকের ব্যথা মাঝে মাঝে ডান দিকেও যে হচ্ছে। নাহ্, ডাক্তার দেখাতেই হবে।

যাঁদের ভয় হওয়ার কথা তাঁরা নির্বিকার। ভয়ে মরেন নিরীহ নিষ্পাপ সুস্থ মানুষ। এমনই এক সুদেহী ও সুস্থ যুবক, যিনি মদ তো দূরের কথা সিগারেটও খান না, নিয়মিত জিমে যান। তড়িঘড়ি করে তিনি হেলথ চেক আপ করেন। কী পরীক্ষা, কোথায় ডাক্তারি পরীক্ষা এসব নিয়ে ভাবার অভ্যেস ভুলিয়ে দেয় কাগজের, টেলিভিশনের আর মোবাইলের ভেসে আসা 'হোল বডি চেক আপের' সস্তায়, তিনশ ঠাকায় তিনশ তেত্রিশ রকমের পরীক্ষার বিজ্ঞাপন। মোবাইলে অঙ্গুলি হেলনে আর যৎকিঞ্চিত অর্থদণ্ডে নিমেয়ে হয়ে যায় একগাদা ডাক্তারি পরীক্ষা। দুঃখের কথা, যত সহজে পরীক্ষা হয়ে যয়, তত সহজ নয় পরীক্ষার ফল হজম করা। আধুনিক ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা এক যাঁতাকল। পাশ করা মুস্কিল। বেরিয়েই যায় কয়েকটা সমস্যা—ইউরিক অ্যাসিড, বিলিরুবিন, পিএসএ, ইত্যাদিতে পার পেয়ে গেলেও ইসিজি এক কঠিন ঠাঁই। সুস্থ মানুষের ইসিজি স্বাভাবিক বলে দাগিয়ে দিলে হাসপাতাল আর ডায়াগ্নস্টিক সেন্টারের আর্থিক ক্ষতি হয়। কম্প্যুটারাইজড ইসিজি মেশিনের এলগরিদম্ যতই 'এ আই' দাগানো হোক না কেন, ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইসিজি মেশিনের কৃত্রিম (চতুর) বুদ্ধি এখনও মানুষকে টেক্কা দিতে পারে। সযত্ন চেষ্টায় কম্প্যুটারাইজড ইসিজি মেশিনের সম্ভাব্য অস্বাভাবিক রিপোর্টে তাই মানুষ ডাক্তারের কলমের সম্মতির আঁচড় পড়তে পায় না। সাধারণ ও সস্তার ইসিজির ভ্রূকুটিই যথেষ্ট। এবার ধরে নেওয়া যাক করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম। বারোয়ারি বিজ্ঞাপনের চিল চিৎকারে (corporate noise) করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামের পরীক্ষার জন্য আজকাল চাপাচাপি করতে হয় না। ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর করার জন্য এক ফাঁকে ইকোকার্ডিওগ্রাম আর হল্টার পরীক্ষা হয়ে যায়। ইসিজির রিপোর্ট তবু সোজাসাপ্টা। ইকোকার্ডিওগ্রাম আর হল্টার পরীক্ষার ফলাফল মোটেই তেমন নয়—গুগলে উত্তর মেলে না আদতে হার্ট ঠিক আছে কি না। ওষুধের দোকানদার, মায় পাড়ার ডাক্তার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বলেন হার্টের ডাক্তার দেখান।

কর্পোরেট হাসপাতালের বিনা পয়সার হেলথ চেক আপের এই তত্ত্বকথা সাধারণ নয় এমন হাতে গোনা কিছু ডাক্তার ও অ-ডাক্তার জানেন। তাঁরা নগণ্য বলে তাঁদের বাদ দিয়েই চিকিৎসা ব্যবসার নীল নক্সা (ব্লু প্রিন্ট) তৈরি হয় ও চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা মুনাফা ঘরে তোলেন। সর্বদা ভুল ধরার সমীকরণ (এলগরিদম) নিয়ে কম্প্যুটারাইজড ইসিজি মেশিন একগাদা সুস্থ মানুষকে হার্টের রোগীর তকমা এঁটে দেয়।

কম্প্যুটারইজড ইসিজি মেশিন খুঁত ধরার চেষ্টায় স্বাভাবিক রিপোর্ট দিতে ভুলে যায়। ডায়াগ্নস্টিক সেন্টার মাঝেমধ্যে সেই ইসিজি রিপোর্টে কোনো এক জ্যান্ত ডাক্তারের সই-সাবুদ করেন বটে, তবে তাতে কোনো অন্তিম ফলাফলে হেরফের হয় বলে মনে হয় না। একদিকে যান্ত্রিক ইসিজি জালের ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে যান আসল হার্টের রোগী। আবার ভুলভাবে ইসিজি জালে আটকে যান সুস্থ মানুষ। ইসিজির রেখাচিত্র রোগীর কাছে রহস্যের, রিপোর্ট লেখা ডাক্তারের কাছে তেমনই চাপের।

আজকাল কম্প্যিুটারাইজড ইসিজির যুগে ডাক্তারবাবু ইসিজি চিনতে পারেন না। এ আই, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল

ইন্টেলিজেন্সওয়ালা ইসিজি মেশিন থাকলে নবীন ডাক্তারের নিজের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করতে হয় না। সেটাই সহজ। ইসিজি চেনার অব্যবহারে ডাক্তারের নিজের বুদ্ধি হারিয়ে যায়। ইসিজি যাই হোক না কেন, অসময়ে বুকে ব্যথা নিয়ে রোগী এলে চোখ বুজে নবীন ডাক্তার সহজে যেটা করতে পারেন, সেটা হল শহরের তারা-মার্কা বেসরকারি হাসপাতালে রেফার। রোগী সরেস না হলে সরকারি হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে সারা রাত ...। মানে ঘাড় থেকে আপদ বিদায় ও বেসরকারি হাসপাতালের সাম্মানিক (পড়ুন, কাট মানি) প্রাপ্তি। ডাক্তার আর মেশিনের বুদ্ধির মিলমিশ না হলে চলবে বিস্তর উচ্চ মাত্রার পরীক্ষা নিরীক্ষা। আড়ালে হাসবেন হাসপাতালের মালিক, অ-ডাক্তার ভুজিয়ায়ালা বেওসায়ি।

এইসব হার্টের রোগ বা নীরোগের নিশানায় থাকে হার্টের রক্তনালীর খানদানি রোগ—করোনারি আর্টারি ডিজিস। ভরসার কথা এই রোগ হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় না। মারণ আঘাতের আগে অনেকবার ইঙ্গিত দেয়। কোনোরকম ইঙ্গিত ছাড়া যে সকল হার্টের রোগ বাচ্চা বুড়ো সবাইকে একদম যমের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়, সেগুলো সংখ্যাগুরু খানদানি করোনারি আর্টারি ডিজিস নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব হার্টের অন্তর্নিহিত ও আবশ্যিক তড়িৎ সঙ্কেত উৎপাদনের ও তার পরিবহনের সমস্যার রোগ।

সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকার একটা মৌলিক শর্ত—নিরবচ্ছিন্ন হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ। শুয়ে থাকলে কম হারে, দৌড়লে দ্রুত গতিতে হৃদপিণ্ড কাজ করবে। হৃদপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণেরও একটা পরম্পরা আছে। হৃদপিণ্ডের একটা প্রকোষ্ঠের (ডান অলিন্দ, right atrium) একটা অংশ (Sinu-atrial node) সুনির্দিষ্ট পরম্পরা মেনে অর্কেস্ট্রার ছড়ি হাতে মাস্টারের মতো হৃদপিণ্ডের সব কটা প্রকোষ্ঠের কাজের দেখভাল করে। ছন্দ মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট পরম্পরা মেনে হৃদপিণ্ডের সংকোচন অথবা প্রসারণ করার অক্ষমতার রোগের (Cardiac arrhyythmia) অনেক সময়েই কোনো পূর্বাভাস থাকে না। এই রোগ বিরল বলেই, এর জন্য সচেতনতা আর প্রস্তুতির অভাব থেকে যায়। এই রোগের আঘাত ঠেকানোর জন্য প্রয়োজন সুস্থ অবস্থায় এই রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া ও আপামর জনসাধারণের কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশনের (CPR, Cardio Pulmonary Resustitation) প্রশিক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তার আর রোগীর আত্মীয় পরিজন বোঝেন রোগীর মৃত্যুর জন্য তেমন কাউকে দোষারোপ করা যাচ্ছে না। বাজার গরম করতে মিডিয়া উস্কে দিচ্ছে—অকুস্থলে ডাক্তার ছিল না, কেবল নার্স ছিল, অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল না, রাস্তায় গ্রিন করিডোর ছিল না ইত্যাদি। তবুও হঠাৎ মৃত্যু হানা দেয় জিমনেসিয়ামে, খেলার মাঠে ও বিনোদন পার্কের রাইডে। এই রোগসমূহের সামগ্রিক না 'হঠাৎ মৃত্যু' (Sudden cardiac death)। হঠাৎ মৃত্যু হার্টের বিদ্যুৎ প্রবাহের আধিক্যের বা অনাধিক্যের সমস্যা। টেকনিক্যাল নাম— ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন (Ventricular fibrillation), সিক সাইনাস সিন্ড্রোম (Sick Sinus Syndrome) ইত্যাদি। এই প্রতিরোধের জন্য চাই সুস্থ মানুষের 'হঠাৎ মৃত্যু' রোগের সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া আর টিআর পি বুভুক্ষু মিডিয়ার জ্বালাময়ী ভাষণে অ্যাম্বুলেন্সে সিলিন্ডারের অক্সিজেনের প্রেশারের তারতম্যের মশলা খবর বয়কট করা। দুঃখের কথা, সুস্থ মানুষের 'হঠাৎ মৃত্যু' রোগের সনাক্তকরণের ও আপৎকালীন চিকিৎসা প্রক্রিয়া এখনই লাগু করা যাচ্ছে না জনমানসে এর প্রয়োজনের অনুভবে ও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মদতের অভাবে। রাস্তায়, মাছের বাজারে অথবা স্টেশনে আপনার অপরিচিত এক মানুষ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে আপনি হতবুদ্ধি হয়েও পরে সেই ভিডিও ভাইরাল করতেই পারেন সহজে। তাতে সেই বেচারা অসুস্থ মানুষটির প্রতি সুবিচার হয় না। সোশাল মিডিয়ায় আপনার ভিডিও ভাইরাল হলেও অসুস্থ মানুষটির কোনো উপকার হয় না—বরং তার অসহায়তা আপনার কাছে একটা পণ্য বলে মনে হয়। আপনার পাশের মানুষটির হঠাৎ মৃত্যুর অবস্থা দেখলে, ভয় পেয়ে পালিয়ে না গিয়ে আপনাকে কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR) দিতে হবে। সোশাল মিডিয়ায় সেটা ছড়িয়ে দেওয়া বা মিডিয়ার বাইটের চেয়ে সেটা কাজের। কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন নিয়ে বিস্তর খবরাখবর, ভিডিও ও লেখালিখি অন্তর্জালে আছে, সম্ভব হলে এই পত্রিকায় পরে লেখা যাবে।

বাকি রইল হার্টের ভাল্বের ব্লক আর হার্ট ফেলিওর—হার্টের চারটি ভাল্ব। হার্টের বাম দিকের দুটি ভাল্ব— মাইট্রাল ও এওরটিক ভাল্ব। এই দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে কৈশোরে আক্রান্ত হওয়া রিউম্যাটিক রোগে মাইট্রাল ও এওরটিক ভাল্ব অকেজো হয়ে যাওয়ার রোগ এখন বিরল। আধুনিক চিকিৎসার দৌলতে সামগ্রিকভাবে নাগরিকগণ দীর্ঘায়ু হওয়ার ফলে আজকাল প্রবীণ নাগরিকদের এওরটিক ভাল্বে ক্যালসিয়াম জমে গিয়ে ভাল্ব

অকেজো হওয়ার রোগ হচ্ছে বটে, তবে সেই রোগও সংখ্যায় নগণ্য।

ক্রমবর্ধমান হার্ট ফেলিওরের রোগ—খবরের কাগজে, পাড়ার আড্ডায়, টেলিভিশনে আমরা প্রায়ই শুনি কেউ একজন হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। সদ্য মৃত মানুষের মৃত্যু-শংসাপত্রে (death certificate) প্রায়শই লেখা থাকে হতভাগ্য মানুষটি হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যখন তাঁর সামনে বসা মানুষটিকে বলবেন আপনার রোগের নাম 'হার্ট ফেলিওর'—তখন বুঝতে হবে তিনি এমন এক হার্ট ফেলিওরের কথা বলছেন, তাতে রোগীর আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে হার্ট ফেলিওরের অন্য সংজ্ঞা—হার্টের রক্ত পাম্প করার কাজের জোর কমে যাওয়ার রোগ। খানদানি হার্টের রোগে রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার রোগ, হার্টের কিছু ভাল্ব অকেজো হয়ে যাওয়ায় রোগ, ডায়াবেটিস রোগে হার্টের পেশির পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়ায় রোগ ও কিছু গর্ভবতী মহিলাদের নিজের ও ভ্রূণের—এই দুইয়ের শরীরে রক্ত পাম্প করার কাজে হাঁপিয়ে যাওয়ার রোগে হার্ট প্রয়োজন মতো দক্ষতায় রক্ত পাম্প করতে পারে না।

এই রোগে পরিশ্রম করলে মানুষটির অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট হয়, পরিশ্রমের সময়ে বারবার বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতে হয়, রাতে চিৎ হয়ে শোয়া যায় না, মাঝরাতে শ্বাসকষ্টের কারণে ঘুম ভেঙে যায়, উঠে বসলে তবেই শ্বাসকষ্ট কমে। এই সব হলেও রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয়, এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে বিভিন্ন কারণে, তবে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু সাধারণত হয় না। **এই শতাব্দীতে হার্ট ফেলিওরের রোগের খান চারেক যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দৌলতে একদা সম্ভাব্য মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আসা ও ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনীয় হার্ট ফেলিওরের রোগের সেই ভীতি এখন আর নেই।** আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগে হার্ট ফেলিওরে আক্রান্ত মানুষ কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘজীবন বেঁচেবর্তে থাকছেন। **উমা**

বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলে বাস করতে শেখা

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

ডিসেম্বরের ২০০৪ সালে উত্তর-পূর্ব জাপানের সুনামির সমুদ্র উপকুলের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার সময় আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল কতকগুলো পাথরের মাইল ফলকের মতো শ'য়ে শ'য়ে মাটিতে পোঁতা আছে। প্রাচীন জাপানিতে লেখা ধুলো আর কাদার আস্তরণে ভেদ করে বোঝা যাচ্ছিল কতগুলো ছয় শতাব্দী প্রাচীন। পরিষ্কার করার পর বোঝা গেল যে ওগুলোর সবকটাতেই একটা সাবধান বাণী ছিল—এই জায়গা থেকে সমুদ্রের দিকে যেন আর কোনো কনস্ট্রাকশন করা না হয়। এই প্রযুক্তির কারিগরী উন্নতির দিনে এই সব সাবধান বাণী উপেক্ষিত হয়েছিল।

ফলস্বরূপ ---বসতি ও নির্মাণ পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া—জীবন ও সম্পদের unprecedented ক্ষতি! জাপানের সুদৃঢ় অর্থনীতি দর্শক না হলেও কয়েক বছর পিছিয়ে গেছিল।

হতাশ হয়ে যখন দেখি যে সেই ভুল আমাদের কাছেই করা হচ্ছে, বিশেষ করে সুন্দরবনে, সতর্কবার্তাগুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস 'দি হাংরি টাইড'-এ পোর্ট ক্যানিং-এর কাহিনী যারা এই আখ্যানটি সম্বন্ধে ওয়কিবহাল নন তাদের জন্য এর সারাৎসার কাজে লাগবে। হুগলি নদীতে দ্রুত পলি পড়ে কলকাতা বন্দর অকেজো হয়ে যাবার আশঙ্কায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আরেকটি বিকল্প বন্দর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। একটি বিকল্প স্থান বাছাই করার জন্য স্থাপিত কমিটি হুগলির দক্ষিণপুর্বে মাতলা নামে খাড়ির উৎসে একটি জায়গা নির্বাচন করলেন। তবে এই নির্বাচনটি সর্বসম্মতিক্রমে হয় নি। এই কমিটি একজন প্রাক্তন নাবিক সদস্য হেনরি পিডিংটন এ নির্ধারণে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে এই সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চলে ঢড়ের জলোচ্ছ্বাসে এই স্থানটি আরও বেশি অরক্ষিত vulnerable হবে।

তাঁর গভীর গবেষণালব্ধ যুক্তিগুলো চরম সিদ্ধান্তে উপেক্ষিত হয়েছিল। তিনি গভর্ণর জেনারেলের কাছে আপিল করা মনস্থ করলেন। চিঠিটি একটি উপস্থাপনের রত্ন, এখন পর্যন্ত তুলনাহীন। কিন্তু তিনি বিফল হলেন। সরকার এগিয়ে চলল এবং জাহাজঘাটা, জাহাজের বিশ্রামের জায়গা, গুদামঘর নিয়ে একটি পরিপূর্ণ বন্দর ১৮৬৮ সালে মহা ধুমধামের সঙ্গে উদ্বোধন হল। একে নাম দেওয়া হল 'ক্যানিং বন্দর'। যিনি এটা কল্পনা করেছিলেন তাঁর সম্মানে। অবশ্য পিডিংটনের নিকৃষ্টতম আশঙ্কা সত্যি হতে বেশি সময় লাগে নি।

তিন বছরের মধ্যে একটি মাঝারি সাইক্লোন ৬ ফুট একটি চলমান

জলের পাহাড় এসে নবনির্মিত বন্দরটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আরও চার বছরের জন্য বন্দরটি চালু বলে গণ্য করা হয়েছিল। সম্ভবত সরকারের মুখ রক্ষা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৮৭১ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও একটি প্রচণ্ড ভুলের চিহ্ন এখনও বহন করে আসছে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু সাইক্লোন বাহিত জলোচ্ছ্বাস (storm surge) খুবই নিয়মিতভাবে হয়। প্রাণহানির পরিমাণও প্রচুর হয়ে থাকে।

সুন্দরবনকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা এই প্রথম নয়। ১৮২২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের বৃহত্তম দ্বীপ সাগরদ্বীপ পুনরুদ্ধার করতে মনস্থ করলেন, যাতে সেখানে ব্যাপকভাবে চাষ করা যায়।

প্রথমে কোম্পানির কর্তারা আরাকান উপত্যকা থেকে পাঁচটি পরিবারকে গিনিপিগ হিসেবে সেই ঘন জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপে নিয়ে এল, যেখানে কোনো মনুষ্য বসতি ছিল না। যখন তারা গেল তখন আরও বেশি সংখ্যক উপজাতি আনা হল শ্রমিক হিসেবে। এবং কোম্পানি বৈষয়িক কৃষি হিসেবে শেয়ার বিক্রি করতে লাগল। ১৮৩১-এর অক্টোবরে একটি সাইক্লোন পুরো বালেশ্বরের তটভূমি ডুবিয়ে দিয়েছিল , যে ঘটনা উপেক্ষা করা হয়েছিল। যদিও তাতে ২০,০০০ প্রাণহানি হয়েছিল। ১৮৩৩-এর মে মাসে একটি সাইক্লোন সাগরদ্বীপ জলমগ্ন করে ৭০০ মতো প্রাণ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সুন্দরবন প্রধানত একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের নদী সমবায় প্রধানত যা দিয়ে বয়ে আনা জমা পলি থিতিয়ে গিয়ে তৈরি। আজ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়া সমতল জলাভূমি তৈরি করে চলেছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিকল্পনা ছিল অঞ্চলটি কৃষির জন্য পরিষ্কার করতে। অঞ্চলটি জমিদারদের ইজারা দেওয়া হল। যারা জায়গাটি বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেললো যাতে জোয়ারে নোনা জল ভেতরে ঢুকতে না পারে। ২০০৯ সালে 'আইলা'র ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ এর একটি উদাহরণ।

উচ্চ ফলনশীলতা আর কলকাতার নৈকট্য লোভী জমিদারদের আকর্ষণ করেছিল। জনবসতি বেড়ে চলল ও কালক্রমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে সুন্দরবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশে ছড়িয়ে পড়ল।

স্বাধীনতার পর জমিদারি উচ্ছেদ হওয়ায় এই ৩৫০০ কিমি জমিদারি বাঁধগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায় প্রাদেশিক সরকারের ওপর বর্তালো।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রাণ সাইক্লোনে ক্ষতি হয়েছে। এ অঞ্চলে ১২ মিটার উঁচু (আধুনিক ৫ তলা বাড়ির সমান) ঝড় আঘাত করার পাকা খবর আছে। এই দ্বীপগুলোর বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ করার জন্য দরকার পোক্ত দেয়াল তৈরি করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যথোপযুক্ত উচ্চতার দেয়াল এই নতুন তৈরি মাটির ওপর তৈরি করা কঠিন। যাঁরা হল্যান্ডের আদর্শ বলে উল্লেখ করেন তাঁরা দু'দেশের ভূ-প্রকৃতির বৈপরীত্য পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। যদি সুন্দরবনে নির্মাণ প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব করাও যায় তবু এটা ভারতের মতো দেশের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। এই দ্বীপগুলোতে বসবাস করা পাথরপ্রতিমা সহ সবচেয়ে বড় ও জনবহুল সহ এরকম কোনো সুরক্ষা ছাড়াই, একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির চূড়ায় থাকার মতো বিপজ্জনক।

সদাসর্বদা ঘটিত বিপদগুলিকে 'দ্রুত আবির্ভাব' বিপর্যয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাঁধ দেয়া দ্বীপগুলোর ভূমি ক্ষয়ের জন্য অধিবাসীরা বাধ্য হয়েছে সরে যেতে। ঘোরামারা দ্বীপটি একটি চরম উদাহরণ। প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপের ফল।

জলবায়ু বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে ঘটা সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে এর অনেক দ্বীপই জলের তলায় চলে যাবে। তাই যে সব দ্বীপগুলি নাম-কা-ওয়াস্তে মনুষ্য বসতির জন্য যোগ্য করে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো থেকে পরিকল্পিতভাবে ও ক্রমান্বয়ে মানুষজন সরিয়ে আনার সপক্ষে একটি প্রবল শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে।

অবশ্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো সহজ কাজ নয়। পুনর্বাসনের সমস্যা ছাড়াও এই বিশাল সংখ্যক জনতাকে কোনো নতুন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা পশ্চিমবাংলার জমির অভাবের কারণে কার্যত অসম্ভব। একটি পন্থা হচ্ছে নতুন বসতি স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। অধিকাংশ বসবাসকারীদের সচেতন করতে হবে এই বন্যা সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চলে বাস করার আনুষঙ্গিক বিপদ সম্পর্কে। আমাদের দেশে, বিদেশেও যেখানে মানুষ এ জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সহবাস করতে শিখেছে। সুন্দরবনের দ্বীপগুলোর অধিবাসীরা এদের অভিজ্ঞতা থেকে সুফল পেতে পারে। তেমন সরকারও কখন এবং কী করণীয় শিক্ষা পেতে পারে।

উমা

জীবরাসায়নিক অস্ত্র পরিচিতি

শেষ পর্ব

শংকর ঘটক

জীবিত প্রাণীজ পদার্থ বা অর্গানিজম্ অথবা অর্গানিজনজাত দূষিত পদার্থ অর্থাৎ জীবাণু ব্যবহার করে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং গাছের ওপর আক্রমণ হল জীবরাসায়নিক যুদ্ধ। জীবরাসায়নিক যুদ্ধে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ব্যবহার করা হয় শত্রু রাষ্ট্রর ওপর। এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য রোগের বিস্তার—মহামারী। উদাহরণ : অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী স্থানীয় আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে গুটি বসন্তের জীবাণু লাঞ্ছিত কম্বল বিতরণ করেছিল। উত্তর আমেরিকা দখল করার জন্য সেটা ছিল অন্যতম একটি কৌশল। ফলে গুটি বসন্তের মহামারী দেখা দিয়েছিল সেখানে (Carl Waldman's Atlas of the North American Indian [NY: Facts on File, 1985])

জীবরাসায়নিক অস্ত্রের কালপঞ্জি

সাল	আক্রমণের বিবরণ
৪০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ	দক্ষিণ সাইবেরিয়ার যাযাবর গোষ্ঠী সাইথেনিয়ানরা লড়াই করার অস্ত্র রূপে সার মেশানো পচা রক্ত অথবা গলিত মৃত দেহে তিরের ফলা ডুবিয়ে নিত।
৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ	পারস্য, গ্রিক এবং রোমের সাহিত্য বিবরণে কূপ এবং জলাশয়ে মৃত প্রাণীর দেহ ফেলে দূষিত করার কথা আছে।
১৯০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ	মাটির হাঁড়ি ভর্তি বিষাক্ত সাপ প্যারগামনের রাজা ইউমেনেস ২-এর জাহাজে নিক্ষেপ করে ইউরিমেডনের যুদ্ধে হ্যানিবাল জয়লাভ করে।
দ্বাদশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ	রোমের সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা মৃত সেনাদের গলিত দেহ শত্রু সীমার জলাশয় দূষিত করার জন্য কাজে লাগাত।
চতুর্দশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ	কাফ্‌ফা নগর অধিকার করার সময় টারটার বাহিনী শত্রু সেনার ছাউনিতে প্লেগে মৃতদেহ ফেলে মহামারীর সৃষ্টি করে।
১৭১০	এস্টোনিয়ার রেভালে সুইডিস সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলার জন্য রুশরা প্লেগে মৃতদেহ ব্যবহার করেছিল।
১৭৫৪-১৭৬৩	ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান নামে খ্যাত যুদ্ধে ব্রিটিশ ফৌজ স্থানীয় জনসাধারণের হাতে গুটি বসন্তর জীবাণুযুক্ত কম্বল বিতরণ করেছিল মহামারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	জার্মান বাহিনী যুদ্ধাস্ত্র রূপে অ্যানথ্রাক্স, গ্ল্যানডারস, কলেরা ইত্যাদি রোগের জীবাণু কালচার করেছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গে প্লেগ, মেসোপটেমিয়ার খচ্চরের দেহে এবং ফরাসী অশ্ব বাহিনীতে গ্ল্যানডারসের জীবাণু সংক্রমণের অভিযোগ।
১৯২৫	১০৮টি রাষ্ট্রের সাক্ষর নিয়ে প্রথম জীবরাসায়নিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত জেনেভা প্রোটোকল। দুর্ভাগ্যবশত নিয়ন্ত্রণের কোনো নির্দেশনামা ছিল না।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	ইউনিট ৭৩১ নামে কুখ্যাত জাপানের জীবরাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার গোপন কার্যালয়। বন্দী সেনাদের দেহে পরীক্ষামূলক রোগজীবাণু সংক্রমণ ৩০০০-এর ওপর বন্দীর দেহে প্লেগ, অ্যানথ্রাক্স, সিফিলিস ইত্যাদি রোগজীবাণুর পরীক্ষামূলক সংক্রমণ ঘটানো হয়।
১৯৪২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ওয়ার রিসার্চ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবরাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুতির প্রয়াস। তালিকায় অ্যানথ্রাক্স, বটুলিনাম টক্সিন।
১৯৪৪	সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর অ্যানথ্রাক্স আর বটুলিনাম টক্সিনের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা।
১৯৫০ এবং ৬০-এর দশক	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবরাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা।
১৯৭৯	সোভিয়েত রাশিয়ার জীবরাসায়নিক অস্ত্রাগার থেকে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর আকস্মিক সংক্রমণে ৬৬ জনের মৃত্যু।
১৯৮০ থেকে	সন্ত্রাসবাদীদের কাছে জীবরাসায়নিক অস্ত্র পৌঁছনো শুরু।

সারণি-২

বিভিন্ন রাষ্ট্রের রোগ-জীবাণু ঘটিত যুদ্ধাস্ত্র কার্যক্রম

রাসায়নিক				জৈবরাসায়নিক (জীবাণু)	
রাষ্ট্র	কর্মসূচি	সম্ভাব্য পদার্থ		কর্মসূচি	সম্ভাব্য রোগ
কানাডা	নির্ধারিত	মাস্টার্ড, ফসজিন, লিউইসাইট		শুরু: ১৯৪১ শেষ: ১৯৪৫	অ্যানথ্রাক্স, ব্রুসলোসিস, রকি মাউনটেন, স্পটেড ফিভার, প্লেগ
ফ্রান্স	নির্ধারিত	মাস্টার্ড, ফসজিন		শুরু: ১৯২১ শেষ: ১৯৪০	পোটাটো বিটল, অ্যানথ্রাক্স সালমোনেলা, কলেরা, রিনডরপেস্ট, বটুলিনাম টক্সিন, রিসিন
জার্মান	নির্ধারিত	মাস্টার্ড, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, টাবুন, সারিন, সোমান		শুরু ১৯১৫ শেষ ১৯৪৫	গ্ল্যানডারর্স, অ্যানথ্রাক্স, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিস, প্লেগ, রিনডারপেস্ট, টাইফাস, ইয়েলো ফিভার, পোটাটো বিটল, পেটাটো ব্লাইট
ইরান	নির্ধারিত	মাস্টার্ড, সারিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড, ফসজিন			অ্যানথ্রাক্স, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিস, বটুলিনাম টক্সিন, মাইকোটক্সিন
জাপান	নির্ধারিত	ফসজিন, মাস্টার্ড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, লিউইসাইট, ক্লোরোপি করিন		শুরু ১৯৩১ শেষ ১৯৪৫	অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ, গ্ল্যানডার্স, টাইফয়েড, কলেরা, ডিসেন্ট্রি, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, গ্যাস গ্যাংগ্রিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টিটেনাস, টিউবারকুলোসিস, টুলারেমিয়া, সালমোনেলা, টাইফাস, গ্ল্যানডারর্স
উত্তর কোরিয়া		অ্যাডামসাইট, মাস্টার্ড, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, টাবুন, সারিন, সোমান সায়ানোজেন ক্লোরাইড, ভিএক্স			অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ, ইয়েলো ফিভার, টাইফয়েড, কলেরা, টিউবারকুলোসিস, টাইফাস, স্মল পক্স, বটুলিনাম টক্সিন
দক্ষিণ আফ্রিকা	নির্ধারিত	থ্যালিয়াম, সিআর, প্যারাক্সন, মাস্টার্ড		শুরু ১৯৮১ শেষ ১৯৯৩	অ্যানথ্রাক্স, কলেরা, প্লেগ, সালমোনেলা, গ্যাস রিসিন, বটুলিনাম টক্সিন
ব্রিটেন	নির্ধারিত	ফসজিন, মাস্টার্ড, লিউইসাইট		শুরু ১৯৩৬ শেষ ১৯৫৬	অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ, টাইফয়েড, বটুলিনাম টক্সিন
ইউএসএ	নির্ধারিত	মাস্টার্ড, ফসজিন, টাবুন, সারিন, সোমান, ভিএক্স, বাইনারি নার্ভ এজেন্ট, লিউইসাইট		শুরু ১৯৪৩ শেষ ১৯৬৯	ভেনেজুয়েলিয়ান ইকুইন এনসেফেলাইটিস, টুলারেমিয়া, অ্যানথ্রাক্স, হুইটরাস্ট, রাইস ব্লাস্ট,

	ব্রুসেলোসিস, স্মল পক্স, ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ইকুইন এনসেফেলাইটিস, আর্জেন্টেনিয়ান হেমোরেজিক ফিভার, কোরিয়ান হেমোরেজিক ফিভার, হেমোরেজিক ফিভার, বলিভিয়ান হেমোরেজিক ফিভার, লাস্সা ইত্যাদি

[সূত্র:https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/03/2008-Chemical-and-Biological Weapons_-Possession-and-Programs-Pastand-Present.pdf]

রাষ্ট্র, সন্ত্রাসবাদী এবং জনগণ : রাষ্ট্রর নৃশংসতা সর্বজনবিদিত। গত শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা হয়ত যাবতীয় ইতিহাসকেও ছাপিয়ে গেছে। তবুও যা একটু ভরসা মানুষের অবশিষ্ট আছে তা আছে রাষ্ট্রর ওপরেই। এর কারণ ভালমন্দ যাই হোক রাষ্ট্রর কাজ সম্পর্কে ভাবে আগাম অনুমান সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাষ্ট্রর নিজের করা চুক্তি নিজেই ভাঙছে। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুচ্ছকে উপেক্ষা করে বহু রাষ্ট্রই রাসায়নিক আর জীবরাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার করেছে। সম্প্রতি সাধারণ নাগরিকের ওপর সিরিয়ার সরকারের সারিন, ক্লোরিন এবং মাস্টার্ড গ্যাসের প্রয়োগ অথবা ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার ড্রোন দিয়ে সি এস গ্যাস ছড়ানো চুক্তি ভঙ্গের উদাহরণ।

অন্যদিকে, সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ অনুধাবন অথবা অনুমান কোনটাই করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই সন্ত্রাসবাদীরা সমাজের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ। রাষ্ট্রর কার্যকলাপ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসংঘ, আংশিকভাবে হলেও, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সন্ত্রাসবাদীরা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন। রাসায়নিক এবং জীবরাসায়নিক অস্ত্রর মতো মারাত্মক সম্ভার, যা সহজেই সংগ্রহ অথবা উৎপাদনও করা যায়, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে পৌঁছে গেলে আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ আছে। জাতিসঙ্ঘ থেকে নিয়মিত সাবধান করা হচ্ছে এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে। 'অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগীদের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে এক বিশাল হুমকি' বলছেন জাতিসঙ্ঘের অন্যতম আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ভ্লাদিমির ভোরোনকভ (Vladimir Voronkov)। সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেলের পরামর্শ 'সন্ত্রাসবাদীজের অস্ত্র এবং অস্ত্র প্রয়োগ উপকরণ সংগ্রহ প্রতিহত করতে হবে। সদস্য রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।'

সূত্র : United Nations Office of Counter-Terrorism Ensuring EffectiveInteragency Interoperability and Coordinated Communication in Case of Chemical and/or Biological Attacks, United Nations, NewYork, 2017

১৯৬১ থেকে ১৯৭১, টানা দশ বছর ধরে ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন সেনার ব্যাপক নাপাম-বর্ষণের ভয়ঙ্কর ঘটনা বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই দশ বছরে মার্কিন সেনা ৪ লক্ষ টন নাপাম বম ফেলেছিল ভিয়েতনামে (Global Security.org) বহুল প্রচারিত ছবিতে দেখা যায় যন্ত্রণাকাতর সেইসব শিশুদের মুখ, আশ্রয়ের প্রার্থনায়। ৯ বছরের বালিকা ফান্ থি কিম্ ফুকের সেই নগ্ন অভিব্যক্তি আমাদের চেতনাকে গ্রাস করে গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিদগ্ধ। ইউ এস বিমানবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের বর্ণনায় — 'মনে হত এক একটি বিশাল জ্বলন্ত কম্বল আকাশ থেকে নেমে আসছে। ঐটির সংস্পর্শে আসা মানেই আগুনে পুড়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু'। খনিজ তেল থেকে পাওয়া নাপথেনিক অ্যাসিড আর নারকেল তেল থেকে পাওয়া পামিটিক অ্যাসিডের সাথে গ্যাসোলিন বা পেট্রোল মিশিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে নাপাম বম তৈরি হয়। নাপথেনিকের নাপ আর পামিটিক-এর পাম জুড়ে নাপাম। একটি পাতলা আবরণের মধ্যে এটি থাকে। বাধাপ্রাপ্ত হলে আবরণটি ফেটে যায়, আগুনের সৃষ্টি হয় আগুনের তাপমাত্রা ২৮০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে (১৫৩৮° সেন্টিগ্রেডে লোহা গলে তরল হয়ে যায়। এই বস্তুটি যে কতটা ভয়াবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উমা

বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় অশনি সংকেত

শ্যামল ভদ্র

বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অঙ্কের মতো বিষয়ে ছাত্রদের ভর্তি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। কারণগুলি আমরা প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এবং খবরের প্রতিবেদনে দেখতে পাচ্ছি, এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে তর্ক-বিতর্ক লেগেই আছে, তাই বিস্তারিত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বলার অবকাশ রাখে না। এই অবক্ষয় শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, যা বলার চেষ্টা করব এই প্রতিবেদনে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ধারা এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা সর্বজনবিদিত, শুধু তাই নয় সেই ধারা স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের দরুন ১৯৬০ সালের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বিজ্ঞান চর্চায় ও গবেষণায় পিছিয়ে পড়তে থাকি। চরম দারিদ্রতা, খাদ্যসংকট, পর পর কয়েকটি যুদ্ধ, ও উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের রৈখিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও দেশের বেশ কিছু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের উৎকর্ষতা বজায় রেখেছিল, যেখানে শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের পাঠ শেষে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আই আই টি, আই আই এম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়াই তাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নেয়। সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে, তবে ২০০০ সালের পর থেকে চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করে মূলত কম্পিউটার সায়েন্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজির মতো বিষয়ের অতি দ্রুত বাণিজ্যিক সাফল্যের কারণে। কিন্তু সেখানেও—সারা পৃথিবী জুড়েই এখন ভাটার লক্ষণ স্পষ্ট, সংকটের গভীরতা যে কতটা তা এখনও আমাদের সাধারণ বোধের বাইরে।

২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত ৯৯তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন যে, গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় বিজ্ঞানের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। উল্লেখ করেছিলেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় অর্থাৎ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দুর্বল শিক্ষাদান এই অবক্ষয়ের জন্যে মূলত দায়ী। তিনি আরও বলেছিলেন, আমাদের দেশের প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলি উচ্চমানের নয় এবং প্রতিবেশী চীনের সাথে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার তুলনা করেও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থাগুলির উচিত প্রতিবেশী উন্নত দেশগুলির সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত হল এই যে, বিজ্ঞান শাখার সমস্ত স্তরে মৌলিক বিজ্ঞানে শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নতমানের নয়, গবেষণা পরিচালনায় অত্যধিক আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ এবং বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর সরকারি আদেশ ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচনায় আরও উঠে এসেছে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান খুবই নিম্নস্তরের, যার অর্থ হল পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ থাকেই না। ফলস্বরূপ, তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আকর্ষণ অনুভব করে না। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ভাল ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে, যা ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির উৎকর্ষের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের দেশের মানুষের বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ পরিমাপ করার জন্য কোনও গুরুতর মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে জানা নেই; যদিও কিছু কিছু সময়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা হয়েছে ঠিকই, যা নীতি নির্ধারণে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় নি। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোট্ট বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন— 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' আমরা কখনোই তাঁর কথার মান্যতা দিতে পারি নি। তাই এইসব নানাবিধ কারণে মূলত প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি, এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের অস্পষ্ট এবং ভ্রান্ত নীতি।

৯৯তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে মোহালির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IISER)-এর অধ্যাপক এবং নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (NISTADS)-এর প্রাক্তন পরিচালক রাজেশ কোছার

দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, জাতীয় বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নে ভারতের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলির অবদান প্রায় শূন্য। তিনি আরও বলেছিলেন—'আমরা সকলেই উচ্চ প্রভাবশালী জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে চাই, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে চাই এবং গবেষণার কাজে বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছু সময় কাটাতে চাই। লক্ষণীয় যে, তাঁদের প্রায় কেউই ভারতীয় স্কুল এবং কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখতে চান না।' বেশিরভাগ ভারতীয়ই ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিজ্ঞানীকে চেনেন না এবং বেশিরভাগই কোনও বিজ্ঞানীর নামও বলতে পারেন না, সম্ভবত সি ভি রমন বা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ছাড়া। বিজ্ঞানীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, গবেষণার ফলাফলগুলি বিজ্ঞানের ঘেরাটোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সর্বস্তরে সহজভাবে পৌঁছে দিতে। কৃষি বিজ্ঞানী মনকোম্বু সাম্বাসিভান স্বামীনাথন এই পতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন—'নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে বুদ্ধির চেয়ে ইটের উপর ক্রমবর্ধমান জোর দেওয়া হচ্ছে।' যা এখনো সর্বাংশে সত্য। ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসে আইআইটি দিল্লির স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের সহযোগী অধ্যাপক আদিত্য মিত্তল 'বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার অবনমনের' মূল ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—'বিশ্ব বিজ্ঞানে আমাদের অবস্থান কখন উচ্চ ছিল? আমরা কি রামন, বোস, সাহা, ভাবা, রামচন্দ্রনের সময়ের সাথে নিজেদের তুলনা করছি—এঁরা সবাই ১৯৭০-এর দশকের পূর্ববর্তী যুগের? বর্তমানে দেশের শীর্ষ বিজ্ঞানীরা সহায়ক প্রশাসনিক পদ্ধতি তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে থাকেন, কিন্তু একই বিজ্ঞানীরা, যখন আমলাতান্ত্রিক পদে থাকেন, তখন আমলাতন্ত্রের কঠোরতার কারণে তাদের ধারণা বা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে পারেন না।' তাঁর উল্লেখযোগ্য সংযোজন এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান মোটামুটি প্রতিযোগিতামূলক ছিল, কিন্তু তারপর তা দ্রুতগতিতে পিছিয়ে পড়ে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান তখন তরুণ ছিল, ফলত এর অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা ছিল সামান্য, ভারতে কলেজ ল্যাবরেটরিগুলি সেই সময়ে উৎকর্ষতার নিরিখে ইউরোপের সমকক্ষ ছিল। বিজ্ঞান যত বেশি উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠতে থাকল, আমাদের দেশ সেই গতিতে বিকশিত হতে পারে নি, অর্থাৎ ভারত বিশ্ব বিজ্ঞানের মানচিত্র থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র লক্ষ্য ছিল জিডিপির ছয় শতাংশ খরচ করা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এর সাথে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হয়েছে অবিজ্ঞান চর্চার নানারূপ প্রয়াস, যা আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সমস্যার অভিমুখ নানাবিধ, সেই সাথে যুক্ত আরেকটি মৌলিক সমস্যা হল—ভারতে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের অভাব। তাই প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা সম্ভব হয় নি, ফলে স্কুল শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল রয়ে গেছে।

কিভাবে এই দুর্বলতা দূর করা যায়?

ভারতে তিনটি জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি রয়েছে—ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, ভারত। অনেক রাজ্যেও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি আছে। এছাড়াও, কৃষি, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল বিজ্ঞানের পৃথক অ্যাকাডেমি রয়েছে। এই অ্যাকাডেমিগুলির প্রত্যেকটিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা রয়েছেন।

এই অ্যাকাডেমিগুলি একক বা সম্মিলিতভাবে স্কুল এবং পাড়ায় নাগরিকদের তাঁদের নিজস্ব গবেষণা এবং ফলাফলের সাথে পরিচিত করার জন্য সভা আয়োজন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা যদি সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখেন, বিজ্ঞানের দুর্বল জায়গাগুলি চিহ্নিত করে তাঁদেরকে অবহিত করেন, তাহলে সমাজে যুক্তিবাদী মনোভাবের দ্রুত প্রসার ঘটবে। বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলি বিশেষ করে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' তৈরির চেষ্টা করতে পারে নানাবিধ উপায়ে। জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন—'সত্য এবং নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি, নতুন প্রমাণের সাপেক্ষে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা, পূর্বকল্পিত তত্ত্বের উপর নয় বরং পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের উপর নির্ভরতা' হল বৈজ্ঞানিক মেজাজের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য। এই বৈজ্ঞানিক মেজাজ, যা ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান এবং সংস্কারের চেতনা বিকাশে সহায়তা করে।

তাই ভারতের সংবিধান সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক মেজাজের বিকাশকে একটি মৌলিক কর্তব্য হিসেবে জোর দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক সাফল্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে। বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলি এক্ষেত্রে মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। পাঠকপ্রিয় আকর্ষণীয় বিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধ সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। এখানে অবশ্য অসুবিধের অরেকটি দিক হল বেশিরভাগ গণমাধ্যম সংস্থাই বাণিজ্যিক বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা তাদের দোষ দিতে পারি না, তবে যদি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি মিডিয়ার সাথে জড়িত হয় এবং তাদের আরও বিজ্ঞান সম্পর্কিত গল্প, সংবাদ ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রকাশ বা প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করে, তাহলে বিজ্ঞানের উপর অবিজ্ঞানের আক্রমণ কিছুটা হলেও প্রতিহত করা যাবে। উচিত ছিল সারা দেশ জুড়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা, শুধুমাত্র সর্বশিক্ষা মিশন জাতীয় কিছু প্রকল্প দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।

এবারে আমাদের রাজ্যের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরে ছাত্র ভর্তির হার আশঙ্কাজনকভাবে কম, সব মিলিয়ে স্বীকৃত আসনসংখ্যা সাড়ে নয় লক্ষের মতো, অথচ ভর্তির জন্য আবেদন পত্র জমা পড়েছে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ। ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে, দুই তৃতীয়াংশ আসন ফাঁকা পড়ে থাকবে, এবং বিজ্ঞান শাখায় ছাত্র সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। অন্যদিকে, সংবাদে প্রকাশ গুরুকুল-শিক্ষার্থীরা স্বীকৃত প্রয়োজনীয় ডিগ্রি ছাড়াই আই আইটি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুযোগ পাবেন এবং তারা অন্যান্য গবেষকদের সমান মাসিক বৃত্তি পাবে। ভাবতে অবাক লাগে শিক্ষার অঙ্গনে কতরূপ মিশ্র অসম ব্যবস্থা। তাই সমাজে কুসংস্কারমুক্ত সুস্থ চেতনার বিকাশ অসম্ভব বলেই মনে হয়, যার উত্তর খোঁজাটা অত্যন্ত জরুরি।

পড়ুয়াদের বিজ্ঞান শেখানোর উদ্যোগ—আনন্দবাজার পত্রিকার ১৭ জানুয়ারি ২০২০-র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের উদ্যোগে, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর এবং রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় সুন্দরবনের কয়েকটি স্কুলে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখাবার শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে সুন্দরবনে বেশিরভাগ স্কুলেই বিজ্ঞান-ভূগোল-গণিতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদান প্রায় অসম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখা চালু করা যাচ্ছে না বহু স্কুলে। গৃহশিক্ষক রাখার খরচের আশঙ্কাতেও পিছিয়ে যাচ্ছে অনেক পড়ুয়া। বোধহয় রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের চিত্রটা একই রকম।

ফোরামের সদস্য শিক্ষকেরা দু'টি ভেসেলে বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কিছুটা অনুকূল আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে। তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন সন্দেশখালি, কুলতলি, হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন ঘাটে। সেখানে কাছাকাছি একাধিক স্কুলের পড়ুয়াদের একটি স্কুলে এনে এক লপ্তে চারদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কতটা সফল হয়েছিল বলা মুশকিল, কিন্তু সকলের সহযোগিতায় এরকম বিজ্ঞান শিক্ষার শিবির আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরি। ফোরামের অন্যতম এক সংগঠক উল্লেখ করেছিলেন—'ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি তাদের সমস্যা কাছ থেকে বুঝতে চাওয়া আমাদের এই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল যোগদানমূলক।' কোভিড অতিমারী এবং সরকারি সাহায্য অপ্রতুল হওয়ায় সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের কাজ অনেকটাই পিছিয়ে যায়, তবে এখনও ফোরামের মুখ্য সংগঠক অভিজিৎ বর্ধন কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে নিরলস চেষ্টায় বেশ কিছু স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিষয়কে হাতে-কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ক্ষুদ্র হলেও তাঁদের এই উদ্যোগকে উৎসাহ জোগানোটা জরুরি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কর্ণাটকের অগ্যস্ত ইন্টারন্যাশনাল ১৯টি রাজ্য জুড়ে স্কুলে স্কুলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তাঁদের কাজকে সফল করার কাজে অনেক বাণিজ্যিক সংস্থা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কেরালার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংগঠন, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক মেজাজ, যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের লক্ষ্যে। একই লক্ষ্যে সংস্থাটি এখনও কাজ করে যাচ্ছে। ঘোর অমানিশায় আলোক বিন্দুর মতো এঁরা জেগে আছে। একসময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন---সূর্য অস্ত গেলে নেমে আসে গভীর অন্ধকার—তাই কে আছে! দিতে পারে এই আঁধার থেকে মুক্তি। উত্তর নেই—সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু ঘরের কোণে ছোট্ট একটি উজ্জ্বল প্রদীপ ঘোষণা করল—কেন আমি আছি, আমার যতটুকু আলো আছে তাই দিয়ে জগৎকে আলোকিত করব!

উমা

অরণ্য (Forest) কি : প্রাকৃতিক অরণ্য কেন চাই?

শান্তনু গুপ্ত

ফরেস্ট কিন্তু কম কথা নয়। কম করে ১০০ বছর সময় লাগে কোনো জায়গায় তৃণ থেকে গুল্ম হয়ে বড় গাছে পরিণত হতে। একে বলে ইকোলজিক্যাল সাকশেসন। তার ক্লাইম্যাক্সে এসে তৈরি হয় ফরেস্ট। লক্ষ লক্ষ বায়োকেমিকাল রিঅ্যাকশন চলছে একটা প্রাকৃতিক অরণ্যের মধ্যে। ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে, উপরে জঙ্গলের ক্রাউনে বড় গাছের সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis), আর ডালে ডালে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। মাটিতে পোকামাকড়, ডালে বানর, ময়ূর, বসন্তবৌরি, সাথে স্পটেড ডিয়ার, সম্বর হরিণ আর বাঘ, লেপার্ড, সঙ্গে হাতি। ঘাসজঙ্গলে গণ্ডার। তবে না সে অরণ্য! প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রকৃতি জঙ্গল সৃষ্টি করেছে অনেক মাপজোক করে, অনেক চিন্তা আছে এই অরণ্যের পিছনে। অরণ্যের বাতাস, মাটি, জলে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী। এর মানে কি? অন্তত তিন থেকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট অরণ্যের থার্মোডায়নামিক ব্যালান্স অসামান্য। যাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলেন herbs, shrubs, seedlings আর mature trees। কোনো জায়গা (স্পেস) কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ অরণ্যে নষ্ট হয় না। শুধু একটা থেকে অন্যটায় পরিবর্তিত হতে থাকে। সূর্যের ফোটন ফরেস্ট ক্রাউনে কেমিকাল এনার্জি (শর্করা) হয়ে যায়। ক্লাউনের বিপাকের পর সেই পুষ্টি গাছের সারা অংশ মানে পাতায়, কাণ্ডে, ছালে আসে। শুকনো মাসে সেই পাতা (leaf litter) ঝরে আবার মাটিতে (forest floor) ফিরে আসে। মাটির ব্যাক্টেরিয়া তাকে অ্যামোনিয়া (NH_3) বানায়। যা ছিল গাছের ঝরে পড়া বর্জ্য, তাই আবার মাটিতে এসে হয়ে গেল গাছের সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য। এছাড়াও অরণ্যের মাটিতে আছে রাইজোবিয়ামের মতো নানা নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাক্টেরিয়া, যারা সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া করছে। কিছুই যায় না ফেলা। এটাই অ্যামোনিয়া ক্ষার। তাই আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অরণ্যের মাটি অম্ল (acidic) হয় না। Acidity বাড়ে যখন আমরা ফরেস্ট তৈরি করার নামে temperate জোনের গাছ লাগাতে থাকি। এরপর অ্যামোনিয়া থেকে আরও ব্যাক্টেরিয়া মিলে হয়ে যায় নাইট্রেট, সালফার যৌগগুলো হয়ে যায় সালফেট। সব recycle হয়ে উদ্ভিদের কাছে পুষ্টি চলে যায়। জল আর মিনারেল নিঃশব্দে এত মিটার ওপরে উঠছে, আবার পুষ্টি হয়ে নিচে নামছে। এটা তো শুধু একটা। ফরেস্টে এমন লক্ষ লক্ষ কারখানা আছে। সেখানে নিঃশব্দে চলছে লাখখানেক biochemical reaction, হাজারটা বিলিওনিয়ার মিলেও এরকম কোনও শব্দহীন কারখানা তৈরি করতে পারবে না। এত সুসংবদ্ধ এই thermodynamic balance যে পৃথিবীর সব পরিণত ফরেস্টগুলোর photosynthesis/Respiration অনুপাত =1। মানে যা আমদানি সেটাই খরচ। কোনও ল্যাবে এমন complete reaction (যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনও বর্জ্য তৈরি হচ্ছে না) কেউ করে দেখাক তো? এটা শুধু প্রকৃতি পারে। একটা পরিণত ফরেস্টের সালোসংশ্লেষের হার সবসময় প্রায় কনস্ট্যান্ট পাওয়া যায়। এটা কেন? ফরেস্টের জীব বৈচিত্র্য—কেউ ধীর ফটোসিন্থেটিক, কেউ মধ্যম, আবার কেউ দ্রুত। তাই average value বিশেষ বাড়ে কমে না। এই ফরেস্টের মধ্যেই আছে মানুষের বেঁচে থাকার মন্ত্র— heat resistant plant আছে, air pollution resistant plant আছে, heavy metal resistant plant আছে, heavy metal শরীরে মজুত করে রেখে দিতে পারে এমন প্ল্যান্ট আছে। আবার এমন সব প্রাণীও আছে। ফরেস্টে আছে ওষধি বা মেডিসিনাল প্ল্যান্ট। ঘন ফরেস্ট ক্রাউন কভার বর্ষাকালে বৃষ্টিকে টেনে আনে। ফরেস্ট থাকলে তা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা থেকে আপনার শহরকে বাঁচায়। যেমন প্রতিবার সুন্দরবন ঝড়ের সামনে বুক পেতে দেয়। ঝড়ের তাণ্ডবকে বাধা দেয়। আর আপনি কলকাতায় বেঁচে যান। দক্ষিণ ভারতে হিমবাহ নেই। সেখানে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অরণ্য সৃষ্টি করে অজস্র নদী। সেই নদীর জলেই দক্ষিণ ভারতের মানুষ চাষাবাদ করেন। ফরেস্ট জলকে বিশুদ্ধ রাখে। কারণ সেই ফরেস্টের মধ্যে থাকা ভালো ব্যাক্টেরিয়া। ফরেস্ট আর ফরেস্ট ব্যাক্টেরিয়া মিলে পচে যাওয়া পাতা আর অজস্র organics-এর সহযোগে তৈরি করে হিউমাস। এই হিউমাস হল চাষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জৈব সার। এরও কোনো বিকল্প নেই। কোনো ল্যাবে তৈরি করা যায় না। চাষিরা জানে যে ফরেস্টের পাশে থাকা চাষ জমি হল সবচেয়ে উর্বর মাটি। তাই হাতির তাণ্ডবে ফসল নষ্ট হলেও চাষিরা ফরেস্টের পাশে থাকা চাষের জমি ছেড়ে

যেতে চায় না। চাষের জমির আর মানুষের লাগানো প্ল্যান্টেশনের জমির খরা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। অরণ্যের জীব বৈচিত্র্য খরা প্রতিরোধ করতে পারে। কিভাবে? অরণ্যে যে সব গভীর মূলের গাছ আছে তারা খরার সময়েও মাটির গভীর থেকে জল আর পুষ্টি তুলে আনে। তার ফলে উৎপাদন তেমন কিছু কমে যায় না। প্ল্যান্টেশনে যে সব প্রজাতি লাগানো হয় তারা বেশিরভাগই shallow root সিস্টেম। প্রাকৃতিক অরণ্য তার শরীরে সবচেয়ে বেশি কার্বন জমা করে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, অরণ্যের ঘাস জাতীয় প্রজাতিদের থেকেই আসে ভবিষ্যতের গবাদি পশুদের খাদ্যের জোগান। বিদেশী প্রজাতির বাড়বাড়ন্ত প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র প্রাকৃতিক অরণ্য। প্রাকৃতিক অরণ্য থাকলে তবে দেশীয় প্রজাতির গাছ থাকবে। দেশীয় প্রজাতি এই দেশের জলবায়ুর সাথে অভিযোজিত হয়ে গড়ে উঠেছে। তাই দেশীয় প্রজাতির গাছ যত বেশি থাকবে তত সেই মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা থাকবে, তত সেই মাটিতে প্রায়োজনীয় অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, সালফেট থাকবে, তার মধ্যে তত বেশি soil porosity থাকবে।

তাই প্রাকৃতিক অরণ্য আমাদের বাঁচাতেই হবে। ফরেস্টে কেউ হাত দিতে চাইলে, কেউ তাকে কাটতে চাইলে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। কারণ বাড়ির ছাদে ফরেস্ট, অফিসের কার্নিসে ফরেস্ট কি গাড়ির বনেটে ফরেস্ট নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না। বন মহোৎসব করে যেমন তেমন কিছু গাছ লাগিয়ে কোনো কাজের কাজ হবে না। সেগুলো প্রাকৃতির অরণ্যের তুলনায় ছেলেখেলা।

তথ্যসূত্র

Odum, E P Fundamentals of Ecology (New Edition)

Costanza et. al. (1997) The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260

Costanza et. al. (1992) Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management. Island Press, Washington D.C.

Clements F.E. Plant Succession: An analysis of the development of vegetation

J S Singh, S P Singh, (2015) Ecology, Environmental Science and Conservation

উমা

প্রতিবেদন

পুজো অনুদান ও ধর্মীয় তোষণ বন্ধের দাবিতে নাস্তিক মঞ্চের প্রতিবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত পুজো অনুদানের তীব্র বিরোধিতা করে নবদ্বীপে পথে নামে নাস্তিক মঞ্চ। বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট, প্রতাপনগর বাজার, প্রাচীন মায়াপুর, পোড়া মাতলা সহ নবদ্বীপ জুড়ে পথসভা, পোস্টার কর্মসূচি এবং লিফলেট বিলি করে রাজ্য সরকারের ধর্মীয় তোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের প্রায় ৪৫,০০০ পূজা কমিটিকে ১,১০,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী, গণবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী।

সংগঠনের অভিযোগ, সরকারি খরচে ধর্মীয় অনুদান দেওয়া একদিকে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের লঙ্ঘন, অন্যদিকে জনগণের মৌলিক অধিকার—স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার খরচ বঞ্চিত করছে। তারা দাবি তোলে, এই অর্থ দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে, কর্মসংস্থান, শিল্প কারখানা তৈরিতে, শিক্ষকদের বকেয়া ভাতা, কর্মচারিদের ডি এ এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি করা উচিত। সভায় উপস্থিত নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক গণেশ দেবনাথ বলেন, 'জনগণের টাকায় পুজো-অনুদান দেওয়া আসলে রাজনৈতিক ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার কৌশল। সরকারের কাজ ধর্মের প্রোমোটারি করা নয়, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য—এই তিন খাতে ব্যয় না করে ধর্মীয় তোষণে অর্থ নষ্ট করা মানে জনগণকে প্রতারিত করা।'

রাজ্য সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র দাস মন্তব্য করেন, 'ধর্মের নামে কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। রাজ্য সরকার জনগণের করের টাকা জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা অঙ্গন নির্মাণ, পুজোতে অনুদান, পুরোহিত-ইমাম ভাতা দিয়ে সংবিধান বিরোধী কাজ করছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে।'

নাস্তিক মঞ্চের পক্ষ থেকে চার দফা দাবি উত্থাপন করা হয়— ১. সব ধরনের ধর্মীয় খাতে সরকারি অনুদান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ২. সেই অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার খাতে বরাদ্দ করতে হবে। ৩. ধর্মীয় অনুদান ও খরচের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে। ৪. সরকারি অর্থের ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ৫. রাস্তা আটকে গণদুর্ভোগ সৃষ্টি করে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং উচ্চস্বরে ডি জে মাইক বাজানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে—কারণ এতে শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সংগঠন জানিয়েছে, শুধুমাত্র পুজো নয়,মসজিদ, গির্জা বা অন্য যে কোনো ধর্মীয় তোষণমূলক খাতে সরকারি অনুদানও তারা মানতে নারাজ। জনগণের করের অর্থ দিয়ে ধর্মীয় ব্যবসা চলতে দেওয়া হবে না। সভা শেষে নাস্তিক মঞ্চের কর্মীরা ঘোষণা করেন, এ আন্দোলন শুধু নবদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকবে না, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। উমা

জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস পালিত হল বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে

২০.০৮.২০২৫ তারিখে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে পালিত হল জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস। বিকেল ৩.৩০ মিনিটে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নাস্তিক মঞ্চ, জনস্বাস্থ্য মঞ্চ, অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ, আমরা এক সচেতন প্রয়াস, পশ্চিমবঙ্গ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কর্মীরা।

সভায় নাস্তিক মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাধন বিশ্বাস বলেন, 'দেশে ক্রমবর্ধমান কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান, ইতিহাস বিকৃতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে।'

সভায় বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় নিহত বিজ্ঞানমনস্ক আন্দোলনের শহিদ—ডা. নরেন্দ্র দাভোলকার, এম এম কালবুর্গি, গোবিন্দ পানসারে ও সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে। তাঁদের দেখানো পথে কুসংস্কার বিরোধী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন সংগঠনের নেতারা।

কর্মসূচির শেষে উপস্থিত জনতার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ প্রচারের জন্য প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের জন্য সভা, ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা হবে। উমা

উচ্চতম সরস্বতী

বিশ্বের সর্বোচ্চ সরস্বতী প্রতিমা ১১১ ফুট। কলকাতার উপকণ্ঠে এমনই এক নজরকাড়া আয়োজন। উদ্যোক্তারা মনে করেন দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ওই সুউচ্চ মানে পৌঁছে যাবে। এটি হাস্যকর যুক্তি মনে হলেও মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস কতটা গভীরে তা চারপাশের কার্যকলাপ দেখলেই বোঝা যায়। একটা মাটির মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে, ফুল-বেলপাতা, ফল-ফলাদি সাজিয়ে রেখে নিজের, রাজ্যের তথা দেশের উন্নতি প্রার্থনা করে পেন্নাম ঠুকলেই ঠাকুর-দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়বে এমন বিশ্বাস নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিল সমাজের বৃহত্তর মানুষ। বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তমনা মানুষ আর কজনই বা আছে। তবু মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার কঠিন কাজটা চালিয়ে না গেলে তো চলে না। উৎস মানুষ তাই হাজারো প্রশ্ন তুলে কার্যকারণ খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। উমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংখ্যায় 'হুল উৎসব' প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম শ্রী অঞ্জন ঘোষ। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৬ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর২০২৫ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২৫০ টাকা
পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।
Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO.
0083010748838.
IFSC NO. PUNB0008320

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। গ্রাহকদের পত্রিকা স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী	২০০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।